লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

প্রকাশনার ৯৭ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Ahmadi

Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৮২ বর্ষ | ২২ ও ২৩তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ আষাঢ়, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ | ২২ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরি | ১৫ ইহ্‌সান, ১৩৯৯ হি. শা. | ১৫ জুন, ২০২০ ঈসাব্দ

বিশ্বজনীন মহামারী করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় করণীয়

হুওয়াশ্ শাফী

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের লক্ষণাদি পর্যবেক্ষণ করে নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা নিম্নলিখিত হোমিও ঔষধ প্রতিষেধকরূপে (কমপক্ষে তিন সপ্তাহ সেব্য) প্রস্তাব করেছেন। এগুলো বাজার থেকেও কিনে নিতে পারেন আবার চাইলে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জাতীয় কেন্দ্রের হোমিও ডিস্পেন্সারী থেকেও সংগ্রহ করতে পারেন। ঔষধগুলো নিম্নরূপ:

১. (Aconite + Arsenic + Gelsimium)- 200

২. Chelidonium Q (Mother tincture)

বড়দের জন্য

১। ৫টা করে বড়ি সপ্তাহে ২বার করে সেব্য।

২। ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সপ্তাহে ৩দিন অর্থাৎ ২দিন পর পর ১বার সেব্য।

৫-১৫ বছরের শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য

১। প্রতি সোমবার ৫টি করে বড়ি সেব্য।

২। প্রতি বৃহস্পতিবার ৪ চামচ পানিতে ১০ ফোটা ঔষধ মিশিয়ে সেব্য।

৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য

১। ৪টা করে বড়ি প্রতি সোমবার সেব্য।

উল্লেখ্য, প্রকাশিত লক্ষণাদি দেখে এসব ঔষধ প্রস্তাব করা হয়েছে। দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন এগুলোতে কার্যকারিতা দান করেন, আমীন। মহান আল্লাহ্ই একমাত্র আরোগ্যদাতা।

প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন:

ডা. রবিউল হক, ০১৭৩৫-১৫০৮১৫

মহামারী থেকে নিরাপদ থাকার দোয়া

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ،
وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ

অর্থ: হে আমার আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কুষ্ঠরোগ, উন্মাদনা, শ্বেত রোগ এবং সকল মন্দ রোগব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي
الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থ: সেই আল্লাহ্‌র নামে যাঁর নামের দোহাই দিলে আকাশ ও পৃথিবীর কোন জিনিষই অনিষ্ট সাধন করতে পারে না এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গিন গুণবাচক নামের দোহাই দিয়ে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ
وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا

অর্থ: সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে সেই আপদ থেকে রক্ষা করেছেন যাতে তুমি (হে অসুস্থ ব্যক্তি) জর্জরিত আর তিনি আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِي
وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

অর্থ: হে আমার প্রভু! সবকিছুই তোমার সেবক মাত্র অতএব হে প্রভু! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি তুমি কৃপা কর।

এছাড়া সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা তিনবার।

সম্পাদকীয়

নামায:
আধ্যাত্মিক ব্যাধিমুক্ত জীবনের হাতিয়ার

পাঁচ বেলা নামায আদায়ের পূর্বে প্রতিটি ওয়াক্তেই নিজেকে দৈহিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার রীতি অবলম্বন করতে হয়; যা 'অযু' নামে পরিচিত। শারীরিক স্বাস্থ্যবিধিমতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ প্রক্রিয়া নাক ও মুখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রান্তিক অংশ ধুয়ে নিয়ে জীবাণু নির্মূলকরণের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও একজন মুসলমানের জন্য এটি ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। উপরন্তু এর একটি আধ্যাত্মিক মাত্রাও রয়েছে– যে প্রার্থনা শারীরিক পরিশুদ্ধি অনুসরণের মাধ্যমে করা হয় তা আধ্যাত্মিক শুদ্ধির একটি পূর্বশর্তও বটে। প্রকৃতপক্ষে যথাযথ উদ্দেশ্য নিয়ে সুষ্ঠুভাবে অযু করা, নিজ মাঝে ক্ষমা লাভের উপকরণ ধারণ করে; তাই এমন অযু করতে যারা সমর্থ হয় তারা ক্ষমা লাভের যোগ্য হয়ে ওঠে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, **"একজন মুমিন মুসলমান যখন তার মুখ ধুয়ে ফেলবে (অযু করার সময়), তখন সে ভাববে তার চোখ দিয়ে ঘটে যাওয়া পাপ তার অযুর পানির প্রতিটি ফোঁটা দিয়ে বিধৌত হচ্ছে; যখন সে হাত ধোবে তখন, তার ঐ হাত যে পাপ করেছিল তা তার হাত থেকে দূর করতে অযুর পানির শেষ ফোঁটা দিয়ে হলেও কার্যকর করা হবে এবং যখন সে তার পা ধুয়ে ফেলবে, তখন তার পায়ের ওপর ভর করে যে পাপ সংঘটিত হয়েছিল সেগুলোও অযুর পানি ধুয়ে ফেলবে। এর ফলে সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ হয়ে সে প্রত্যাবর্তিত হবে।"** *(সহিহ মুসলিম, হাদীস: ২৪৪)*।

প্রতিবেলার নামাযে বান্দা আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গৌরব গাঁথা এবং তাঁর সাহায্য ও আশীর্বাদের জন্য পরম আকুতি নিয়ে নিজেকে নিবেদন করতে থাকে। একজন, যা কিছু পেয়েছে তার জন্য আল্লাহ্‌র সমীপে অপরিসীম কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অনুভূতির প্রকাশ হল দৈনন্দিন নামাযের অতুলনীয় একটি বৈশিষ্ট্য। এইভাবে প্রতিদিনের নামায আদায় মন এবং প্রাণকে সতেজ করে তোলে এবং দিনভর বান্দাকে অনেকটা তেমনই প্রাণবন্ত করে যেমন দৈহিক খাবার ও খাওয়া-দাওয়া শারীরিকভাবে দেহকে সতেজ ও সচল রাখে।

তখনই আসে সত্যিকারের প্রশান্তি, যখন "এক আল্লাহ্‌র স্মরণে" পুরোটা দিন কাটে।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, **"আলা বিযিকরিল্লাহে তাত্মাইন্নুল কুলুব"** *[১৩:২৯]*। অর্থাৎ- আল্লাহ্'র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে;

হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার মন্তব্য করেছিলেন, **"আমার নামাযের মাধ্যমে আমার সর্বোচ্চ আনন্দ ও সন্তুষ্টি লাভ হয়ে থাকে"** *[সুনান আন নেসাঈ: ৩৯৩৯]*।

অধিকন্তু, নামাযের নিয়মানুবর্তিতার অনুশীলন যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে তা এক অমূল্য চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, যা জীবনের অন্যান্য কার্যক্রমকেও নিয়ন্ত্রণ করে সুষমামণ্ডিত করে দিতে পারে। নামায সর্বতোভাবে কল্যাণকর, তবে এর বাহ্যিক আচারের কাঠামোগত রূপটি সুনিপুণ হলে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক কল্যাণধারা প্রবহমান হয়।

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই-এর ভাষায়, **"নিজের ভেতরটা প্রতিরোধ করে নিজেকে জয় করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই কম।"**

নামাযের আরবী প্রতিশব্দ 'সালাত'। ভাষাতাত্ত্বিকভাবে সালাত একটি আরবি শব্দ যা 'সালা' মূল থেকে এসেছে, যার অর্থ জ্বালানো-পোড়ানো। দৈনিক পাঁচ বেলার নামাযকে সালাত বলা হয়েছে কারণ এই নামায মানুষের আধ্যাত্মিক অসুস্থতাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য কাজ করে। এই শব্দটি কোনও ব্যক্তির প্রার্থনাকালীন সেই অবস্থাকেও বোঝায়– যখন মানবাত্মা তার প্রভুর সাথে আলাপচারিতার গভীর আকাঙ্ক্ষার দহনে জ্বলতে থাকে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, **"...ওয়া আক্বিমিস্‌সালাতা আন্নাস্‌সালাতা তানহা আনিল ফাহ্‌শায়ে ওয়াল মুনকার ওয়া লাযিকরিল্লাহি আকবার"** *[আল-আনকাবুত ২৯:৪৬]*। অর্থাৎ ... এবং নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম থেকে বিরত রাখে এবং নিশ্চয় আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) অবশ্যই সর্বশ্রেষ্ঠ (পুণ্য)।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) একবার প্রতিদিনকার নামাযের সাথে পাঁচবার স্রোতধারায় নিজেকে নাইয়ে নেয়ার সাথে তুলনা করেছিলেন। *[সহীহ বুখারী: ৫২৮]*

যারা এরূপ করবে তারা অবশ্যই পরিশুদ্ধ হবে। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে, **"ফায কুরুনী আযকুরুকুম ওয়াশকুরুলী ওয়া লা তাকফুরুন।"** *(২ : ১৫৩)*

সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও আর আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।

অর্থাৎ- মানুষ আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার অর্থ ভক্তি ও ভালবাসা এবং কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁকে স্মরণ করা, তাঁর নির্দেশাবলী পালন করা, তাঁর পবিত্র গুণাবলী মনের মাঝে গেঁথে রাখা, তাঁর গুণ-কীর্তন করা এবং তাঁর সমীপে যাচনা করা।

অপরদিকে আল্লাহ্ মানুষকে স্মরণ করার অর্থ হল মানুষকে তাঁর নৈকট্য দান করা, তাদের ওপর আশিস বর্ষণ করা এবং তাদের মঙ্গলময় জীবনযাপনের ব্যবস্থা করা।

অতএব, বর্তমান অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে আমাদের প্রত্যেকের উচিত, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্বিক কল্যাণলাভে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই সৌভাগ্যলাভের তৌফিক দিন। আমীন!

সূচিপত্র

৩১ মে ও ১৫ জুন ২০২০

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃতবাণী ৫

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ) ৬

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মোতাবেক ১২ তবলীগ ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র **জুমুআর খুতবা** ৯

আহমদী মুসলিম গবেষকগণ ও ইসলামের স্বর্ণ যুগের পুনরুদ্ধার আহমদীয়া মুসলিম রিসার্চ এসোসিয়েশন (AMRA)-এর সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ১৮

কবিতা:
প্রভাকর
মেহেদী হাসান মুসা ২১

আফ্রিকার প্রকৃত স্বাধীনতা ২২

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি ২৫
মওলানা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

কবিতা:
দাজ্জাল বধ ৩৩

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয় ৩৪
কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহ সংবাদ ৩৫

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত ৩৬

পাক্ষিক **'আহমদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহমদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন
www.theahmadi.org
পাক্ষিক 'আহমদী'র নতুন ই-মেইল আইডি–
pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কুরআন শরীফ

সূরা আল্ কাহ্‌ফ-১৮

قَالَ مَا مَكَّنِّيْ فِيْهِ رَبِّيْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِيْ بِقُوَّةٍ
اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٦﴾

৯৬। সে বললো, ‘এ (ধরনের কাজে) আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন তা অতি উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল (জন) শক্তি দিয়ে[১৭৩০] সাহায্য কর। আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে একটি বড় প্রতিবন্ধক স্থাপন করে দিব।

اٰتُوْنِيْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰٓى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ
الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ
قَالَ اٰتُوْنِيْٓ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٧﴾

৯৭। তোমরা আমাকে লোহার টুকরো[১৭৩১] এনে দাও।’ অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান (ভরাট করে) সমান করে দিল[১৭৩১-ক] তখন সে বললো, ‘তোমরা (এখন আগুনে) ফুঁ দাও।’ অবশেষে সে যখন এ (লোহাকে) আগুনে পরিণত করলো তখন সে বললো, ‘তোমরা আমাকে (গলিত) তামা এনে দাও যেন আমি তা এর উপর ঢেলে দেই।’

فَمَا اسْطَاعُوْٓا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ﴿٩٨﴾

৯৮। সুতরাং (এ দেয়াল নির্মিত হবার পর) তারা (অর্থাৎ ইয়া’জূজ ও মা’জূজ) এটিকে ডিঙ্গাতে পারলো না আর এতে কোন ছিদ্রও করতে পারলো না[১৭৩২]।

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّيْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهٗ
دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ حَقًّا ﴿٩٩﴾

৯৯। সে বললো, ‘এ (কাজ) হল আমার প্রভু-প্রতিপালকের বিশেষ কৃপা। এরপর আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় যখন আসবে তখন তিনি এ (দেয়াল) চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন[১৭৩৩]। আর আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।’

وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِيْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِي
الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ﴿١٠٠﴾

১০০। আর সেদিন আমরা এদের এক (দল)-কে অন্যের (দলের) বিরুদ্ধে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত আঁছড়ে পড়তে দিব। আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন আমরা এদের সবাইকে একত্র করে দিব[১৭৩৪]।

১৭৩০। সাইরাস উক্ত স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে শ্রমিক সরবরাহ করতে বলেছিলেন। ‘কুওয়াহ’ অর্থ দৈহিক শক্তি অর্থাৎ কায়িক শক্তিসম্পন্ন শ্রমিক।

১৭৩১। শ্রমিক ছাড়াও সাইরাস স্থানীয় জনসাধারণের নিকট লৌহ এবং গলিত তামা চেয়েছিলেন।

তামার উপরে লোহার মত মরিচা ধরে না এবং যখন তা লোহার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এই মিশ্রণ অধিকতর কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, মরিচা এবং ক্ষয় থেকে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় প্রকৌশল ও যন্ত্র সাইরাসের দক্ষ কারিগররা সরবরাহ করেছিল।

১৭৩১-ক। এই দুর্গপ্রাচীর কাসপিয়ান সাগর এবং ককেশাস পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল।

১৭৩২। এই প্রাচীর নির্মাণ যখন শেষ হল তখন উত্তর দিক থেকে ইয়া’জূজ-মা’জূজ (গগ এন্ড ম্যাগগ)-এর আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। উক্ত প্রাচীর এত চওড়া ও উচ্চ ছিল যে তাকে ভাঙ্গা বা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এটি ২৯ ফুট উচু এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল (এনসাইক ব্রিট) এবং এতে লোহার দরজা ও প্রহরার জন্য উচ্চ কক্ষ ছিল। এটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে পারস্য সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ করতো।

১৭৩৩। সাইরাস নিশ্চয় ইলহামযোগে সংবাদ পেয়েছিলেন যে, সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া’জূজ-মা’জূজ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তার লাভ করবে এবং তখন এই প্রাচীর তাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। “তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন” কথার তাৎপর্য এটাই। ২১:৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়া’জূজ-মাজূজ সমগ্র পৃথিবীতে তাদের থাবা বিস্তার করবে। রূপক অর্থে “প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া” ইসলাম ধর্মে বিশেষভাবে ইউরোপের তুর্কি জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতা ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিসমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করে দিয়েছিল।

১৭৩৪। ইয়া’জূজ-মাজূজের প্রতাপশালী হওয়ার যুগে পৃথিবীর সকল জাতি একত্রিত হবে এবং সমস্ত বিশ্ব এক দেশের ন্যায় হবে এবং বাইবেল অনুযায়ী জাতি জাতির বিরুদ্ধে লড়বে, রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে এবং ঈর্ষা, ঘৃণা ও অন্যায় আচরণ বা অন্যায় বিচারের আধিক্য হবে। এটা বর্তমান যুগকেই ইশারা করছে। বিগত দুই বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা ভেবে মানুষ চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যিহিষ্কেল ৩০ ও ৩৯ অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন হল ইয়া’জূজ (গগ) এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলো হল মাজূজ (ম্যাগগ)। এখন পর্যন্ত তারা জাতিসমূহের সর্বশেষ রণক্ষেত্রের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে।

হাদীস শরীফ

সুনিবিড় বন্ধনে খিলাফতের রজ্জু আঁকড়ে থাকার নির্দেশ

হযরত উক্‌বা বিন আমের (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের চাচা হযরত আব্বাস (রা.)-এর হাত ধরে বললেন– "যখনই কোন নবুওয়্যাত এসেছে, এরপর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" *(মাজমাউল জওয়াইদ খণ্ড-৫, পৃ: ১১৮)*

হযরত আব্দুর রহমান বিন সাহল (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "প্রত্যেক নবুওয়্যাতের পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে।" *(কানযুলুল উম্মাল, কিতাবুল ফিতন মিন কিসামিল আফআল ফাযলু ফি মুতাফাররিকাতুল ফিতন, খণ্ড: ১১, পৃ: ১১৫)*

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "বনী ইসরাঈল জাতির তত্ত্বাবধান করতেন নবীগণ। যখন কোন নবীর মৃত্যু হতো, তখন অন্য এক নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর দেখ! আমার অব্যবহিত পরে কোন নবী নাই। কিন্তু খলীফা অবশ্যই হবেন আর অনেক হবেন।" *(সহী বুখারী, কিতাবআহাদীসে আম্বিয়া, বাবু মা যাকারা আন বানী ইসরাঈল)*

হযরত সাফিনা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "আমার উম্মতে ৩০ বছর খিলাফত থাকবে। এরপর রাজতন্ত্র শুরু হবে।" *(জামে তিরমিযী, কিতাবুল ফিতন, বাবুল খিলাফাত)*

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "তোমাদের মধ্যে নবুওয়্যাত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এরপর নবুওয়্যাতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর অত্যাচার ও উৎপীড়নের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা পাবে। এরপর জবরদস্তিমূলক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর নবুওয়্যাতের পদ্ধতিতে (পুণরায়) খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর রসূল (সা.) নীরব হয়ে গেলেন।" *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)*

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.)-এর বিষয়ে বলেন– "নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে একটি পোশাক পরাবেন। মুনাফিকরা যদি তোমার এ পোশাক খোলার চেষ্টা করে, তবুও তুমি এটা কখনও খুলবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে এসে মিলিত হও। এ কথা রসূল (সা.) তিন বার বললেন।" *(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল)*

হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "ইমাম হলেন ঢাল, যার নেতৃত্বে ও আনুগত্যে থেকে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করা যায়, আর শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচাও যায়।" *(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ)*

হযরত আকরাম বিন সারিয়া (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন– "তোমাদের জন্য রয়েছে আমার সুন্নত ও খুলাফায়ে রাশেদীন, যারা খোদার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রাপ্ত, তাদের সুন্নতের অনুসরণ করা ফরয। এটি দৃঢ়তার সাথে ধর এবং ভাল করে আঁকড়ে রাখ।" *(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস্ সুন্নাত)*

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "যদি তোমরা দেখ, আল্লাহ্‌র খলীফা ভূ-পৃষ্ঠে বিদ্যমান রয়েছেন, তাহলে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাও, যদিও (এ অপরাধে) দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়া হয় আর তোমাদের ধন-সম্পদ লুট করে নেয়া হয়।" *(মুসনাদ আহমদ, হাদীস নম্বর ২২৩৩৩)*

হযরত উরফাযা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) বলেছেন– "যখন তোমরা এক হাতে একত্রিত হও, আর তোমাদের এক আমীর হয়, তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাদের একতাকে ভঙ্গ করতে চায়, এমনকি তোমাদের জামা'তে কোন মতভেদ সৃষ্টি করে, তাহলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও, তথা তার কথা শুনবে না।" *(সহী মুসলিম, কিতাবুল ইমারত, বাব-হুকমুন মিন ফাউক)*

অমৃতবাণী

‘আমি খোদা তা’লার এক মূর্তিমান কুদরত, আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি দ্বিতীয়-কুদরতের প্রকাশস্থল হবেন

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

“সূফীগণ লিখেছেন– যে-ব্যক্তি কোন শেখ বা নবী-রসূলের পর খলীফা হওয়ার উপযুক্ত হন, সর্বপ্রথম আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর ওপর হক্ নিহিত করে দেন। কোন রসূল বা মাশায়েখ যখন মৃত্যুবরণ করেন, পৃথিবীতে তখন এক ভূমিকম্পের অবস্থা বিরাজ করে। আর এটা ভয়ানক এক সময় হয়ে থাকে। কিন্তু খোদা তা’লা কোন খলীফার মাধ্যমে তা দূর করেন, খলীফার মাধ্যমে পরে এই বিষয়টি সংশোধন করে নতুনভাবে এতে দৃঢ়তা দান করেন।”

মহানবী (সা.) নিজের পর খলীফা নির্ধারণ করে যান নি কেন? এর মাঝে এ রহস্যই ছিল যে, তাঁর (সা.) ভালই জানা ছিল, আল্লাহ্ তা’লা নিজেই এক খলীফা নির্বাচন করবেন। কেননা, এটা খোদারই কাজ। আর খোদার নির্বাচনে কোন ত্রুটি থাকে না। সুতরাং আল্লাহ্ তা’লা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে এই কাজের জন্য খলীফা বানিয়েছেন। আর সর্বপ্রথম তাঁর মাঝেই হক্ নিহিত করেছিলেন।” *(মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ-৫২৪)*

“রহমত অবতরণের দ্বিতীয়-পদ্ধতি হল– রসূল, নবী, ইমাম, আউলিয়া এবং খলীফা প্রেরণ, যাতে তাঁর অনুকরণ ও দিক-নির্দেশনাতে লোকেরা সঠিক-রাস্তায় চলে আসে। আর তাদের আদর্শকে নিজের পথ- নির্দেশিকা বানিয়ে মুক্তি পেয়ে যায়। সুতরাং খোদা তা’লা চেয়েছেন– এই নগণ্য-বান্দার সন্তানদের মাধ্যমে এই দু’টি অংশ যেন প্রকাশিত হয়।” *(সাব্‌জ ইশতেহার, রূহানী খাযায়েন, ২য় খন্ড, পৃ-৪৬২)*

“হযরত আয়েশা (রা.)-এর বক্তব্য– কয়েকটি ফেৎনা, আরবের বিদ্রোহ এবং মিথ্যা-নবীদের আত্মপ্রকাশের কারণে আমার পিতা যখন রসূল (সা.)-এর খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তাঁর ওপর মুসিবত আপতিত হল এবং তিনি খুবই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে গেলেন। এ দুঃখ-যাতনা যদি কোন পাহাড়ের ওপর পতিত হতো, তাহলে সেটাও ধসে পড়ে যেত, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, আর পৃথিবী থেকে মিটে যেত। কিন্তু যেহেতু এটা খোদা তা’লার চিরাচরিত বিধান, খোদা তা’লার কোন রসূলের মৃত্যুর পর যখন তাঁর খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তাঁর মাঝে বীরত্ব, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা ও আত্মিক-শক্তি ঢেলে দেয়া হয়। ইউশা-র পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের ৬ নম্বর পদে আছে– হযরত ইউশাকে আল্লাহ্ তা’লা বললেন, দৃঢ় হও, সাহসী হও। অর্থাৎ মূসা তো মৃত্যুবরণ করেছেন, তুমি দৃঢ় হয়ে যাও। এই আদেশই ভাগ্যের লিখন হিসেবে নয় বরং শরীয়তের আকারে আবু বকর (রা.)-এর হৃদয়ে নাযিল হয়েছিল।” *(তোহ্‌ফায়ে গোলড়াবিয়া, রূহানী খাযায়েন, ১৭তম খন্ড, পৃ-১৮৫)*

অতএব হে বন্ধুগণ! যেহেতু আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা’লার বিধান হচ্ছে– তিনি দু’টি শক্তি প্রদর্শন করেন, যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু’টি মিথ্যা-উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান; সুতরাং খোদা তা’লা তাঁর চিরন্তন-নিয়ম পরিহার করবেন, এখন এটা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়। কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী। এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয়-কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না, কিন্তু যখন আমি চলে যাবো, খোদা তখন তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয়-কুদরত প্রেরণ করবেন, যা চিরকাল তোমাদের সাথে থাকবে। *(আল ওসীয়্যত পুস্তক, বাংলা ৪র্থ সংস্করণ ২০১৪, পৃষ্ঠা: ৬)*

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালায়ে আওহাম (২য় অংশ)
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রণয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.)

(৪৩তম কিস্তি)

তন্মধ্যকার, দাজ্জালের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আলামত বা চিহ্ন হল তার গাধা– যার উভয় কানের মধ্যকার ব্যবধান সত্তর (৭০) বাহু পরিমাণ অনুমান করা হয়। তদনুযায়ী বস্তুত অধিকতর রেলগাড়ীর দৈর্ঘ্য এরকমই হয়ে থাকে। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এগুলো ধোঁয়া তথা বাষ্পের জোরে চলে, যেমন মেঘপুঞ্জ বাতাসের জোরে দ্রুত ধাবমান হয়ে থাকে। এস্থলে আমাদের নবী (সা.) রেলগাড়ীর দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এটি যেহেতু এই খ্রিষ্টান জাতির আবিষ্কার– যাদের ইমাম ও নেতা দাজ্জালি দলটিই বটে। কাজেই উল্লিখিত রেলগাড়ীকে দাজ্জালের 'গাধা' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এখন এর চেয়ে বেশি আর কী প্রমাণ হবে যে, দাজ্জালের বিশেষ চিহ্নগুলো এ লোকগুলোর মাঝেই দৃশ্যমান। এ জাতির লোকেরাই 'মকর' বা প্রবঞ্চনাকে নিত্য সঙ্গী করে নিজেদের সত্তায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে এবং দ্বীন-ইসলামকে এমন ক্ষতিগ্রস্ত করেছে যার নজির দুনিয়ার সূচনাকাল থেকে আজ অবধি অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ লোকদেরই অনুগামী জাতির আবিষ্কার সেই 'গাধা'ও বিদ্যমান, যা 'দুখান' বা বাষ্পের জোরে চালিত হয়, যেমন (হাদীসের বর্ণনানুযায়ী) 'হাওয়ার জোরে মেঘমালা চালিত হয়ে থাকে'। এ লোকদেরই অনুগামীগণ পৃথিবীকে 'আবাদ' বা উন্নত ও সমৃদ্ধ করে চলছে এবং যেকোন দেশ তারা নিজেদের দখলে নিয়ে তাকে বলে, 'এখানকার সব রত্ন-ভাণ্ডার বের করে দাও।' এতে করে তারা সম্পদ আহরণের অসংখ্য উপায়-উপকরণ সেদেশ থেকেই আয়ত্ত করে নেয় এবং অনাবাদ ভূমিকে আবাদ করে এবং শান্তি স্থাপন নিশ্চিত করে। কিন্তু ঐসব রত্ন-ভাণ্ডার তাদেরই পেছনে-পেছনে ছুটে চলে এবং অর্থ-সম্পদ তাদেরই দেশের দিকে আকৃষ্ট হয়ে চলমান হয়। এ বিষয়টি কারই-বা অজানা যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারতবর্ষের রত্ন-ভাণ্ডার ইউরোপের দিকে ধাবমান। ইউরোপের লোকেরা নিজেরাই এসব ভাণ্ডার উত্তোলন ও আহরণ করে এবং এগুলো তাদেরই নিয়ন্ত্রণে তাদেরই দেশের দিকে চালান দেয়।

মোটকথা, যাবতীয় এ হাদীসসমূহে গভীর মনোনিবেশে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) এ যুগের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করেন এবং এ লোকদেরই দাজ্জাল নামে অভিহিত করেন। কুরআন করীমে যদিও বা দাজ্জাল বের হওয়ার কোথাও স্পষ্টতঃ উল্লেখ করা হয় নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে কুরআন করীম 'দুখান'-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে দাজ্জালকে এরই অন্তর্ভুক্ত করেছে। তদুপরি, উল্লিখিত এ যুগ সম্পৃক্ত বর্ণনাও কুরআন করীমে বিদ্যমান যে, দুনিয়া যখন দুখান তথা ধোঁয়াচ্ছন্ন অবস্থার পর 'আল্লাহ্‌র নূর' বা ঐশী জ্যোতি বিস্তার লাভ করবে– এই জ্যোতির্ময় যুগ দ্বারা সেই যুগ বুঝায় যখন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আবির্ভাবের পর পুনরায় দুনিয়া নেকী ও পুণ্যের দিকে মুখ ফিরাবে। নিঃসন্দেহে (বর্তমান) এ যুগটি এখনও 'যু-দুখান' বা ধোঁয়াচ্ছন্ন যুগ হিসেবে সত্যতার প্রকৃতস্বরূপকে অনেক দূরে ছেড়ে কোটি কোটি মানুষ 'শায়াতীনুল-ইন্‌স' কর্তৃক বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার কারণে 'তৌহীদ' (একত্ববাদ), সত্যপরায়ণতা ও ঈমানদারীর গণ্ডি-বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। এখন যদি ধরে নেয়া হয় যে, মহানবী (সা.) এই দাজ্জালের সংবাদ দেন নি যারা বস্তুতপক্ষে (বর্তমান) খ্রিষ্টান পাদ্রী সম্প্রদায়টিই বটে, যাদের নজির দুনিয়ার সূচনাকাল থেকে আজ অবধি খুঁজে পাওয়া যায় না। (যদি তাই হয়) তাহলে মহানবী (সা.)-এর 'কামালতে-কাশ্‌ফী' তথা দিব্যশক্তি সম্পৃক্ত মহতী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ওপর এমর্মে আপত্তি উত্থাপন সাব্যস্ত হবে, তাঁর উম্মত যে এত বড় ফেৎনা বা নৈরাজ্যের সম্মুখীন হবার ছিল– যার ফলে 'সত্তর হাজার' কেন, বরং সত্তর লক্ষেরও বেশি বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত তাঁর অনুসারীগণ ইসলাম ধর্ম থেকে বিমুখ ও বিচ্যুত হয়ে পড়েছে সে-সম্পর্কে কি-না মহানবী (সা.) ঐশী সংবাদ দান করেন নি! কিন্তু ইনসাফ ও ন্যায়ের যথাযত শর্ত ও দাবী অনুযায়ী আমরা যদি স্বীকার করে নেই যে, মহানবী (সা.) এই দাজ্জালের

সংবাদ দান করেছেন এবং তার ‘গাধা’র সম্পর্কেও সংবাদ দিয়েছেন যে, সেটি জল ও স্থল ভেদ করে দূর-দূরান্তে তাদের পৌঁছে দেয় এবং তাদের এক চক্ষুবিশিষ্ট হওয়ার সম্পর্কেও অবহিত করেছেন এবং তাদের বেহেশ্‌ত, দোজখ, রুটির পাহাড় ও অজস্র রত্ন-ভাণ্ডার সম্পর্কেও অবহিত করেছেন। এরপরও দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণিত এই হাদীসসমূহ ছাড়া আর কোন্‌গুলো আমাদের কাছে বিদ্যমান, যা আমরা উল্লেখিত এ দাবীর সমর্থনে উপস্থাপন করতে পারি! আমরা যদি মওজুদ হাদীসসমূহ এই উপস্থিত দাজ্জালের ওপর প্রয়োগ না করি বরং কল্পনা-প্রসূত অন্য কোন দাজ্জাল নিজেদের অন্তরে চিত্রিত করে বসে থাকি– যা অন্য কোন যুগে আত্মপ্রকাশ করবে তবে সে দাজ্জালের জন্য আরও হাদীস কোথাথেকে জোগাড় হবে? এটা স্পষ্ট যে, উপস্থিতকে ছেড়ে কল্পনা ও খেয়ালের দিকে ছুটে যাওয়া নিঃসন্দেহে সত্যকে চাপা দেওয়া ও গোপন করার শামিল। কেননা, যা মওজুদ ও উপস্থিত হয়ে আছে এবং যাকে আমরা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি এবং যে দাজ্জালের নজিরবিহীন ফেৎনা বা নৈরাজ্য স্বচক্ষে অবলোকন করেছি এবং বর্ণিত সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার প্রতীক হিসেবেও অনুধাবন করেছি। তাসত্ত্বেও আমরা যদি তাকে এ সব ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রকৃত স্বাক্ষর ও সত্যায়ণকারী হিসেবে স্বীকার না করি, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এটাই সাব্যস্ত হয় যে, আমরা চাই না রসূল করীম (সা.)-এর কোনো ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হোক। অথচ প্রাথমিক সৎ-সালেহ বুযুর্গদের আদর্শ এমনটি ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি ভবিষ্যদ্বাণী যেন পূর্ণ হয় সেজন্য তাঁরা খুব উদগ্রীব ছিলেন। কা’বা শরীফের হেরেম বা চত্তরে ‘একটি দুম্বা’ জবেহ করা হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণীটির ক্ষেত্রে তাঁরা বাস্তবে কোন দুম্বা জবেহ হওয়ার অপেক্ষায় থাকলেন না। বরং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন-জুবায়র (রা.) যখন শহীদ হলেন তখন তাঁরা নিশ্চিত বুঝে গেলেন, ‘ইনিই সেই (প্রতিশ্রুত) দুম্বা’। অথচ পবিত্র হাদীসে মানুষের নাম ছিল না। বরং সেখানে তো স্পষ্টতঃ ‘দুম্বা’ লেখা আছে। আর সহীহ বুখারী ও মুসলিমে লিপিবদ্ধ সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পর্কে যেখানে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বিবিগণের মাঝে যাঁর হাত অন্য সবার চেয়ে লম্বা তিনিই মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর সবার আগে মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁরা হযরত জয়নব (রা.)-এর মৃত্যুবরণের সময় বিশ্বাস করলেন যে, ভবিষ্যদ্বাণী পুরো হয়েছে। অথচ এ বিষয়টি সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করা হয়েছিল যে, হযরত সওদা (রা.)-এর হাত লম্বা বলে তিনিই প্রথমে মারা যাবেন। প্রাথমিককালের ঐ সকল বুযর্গ যখন দেখলেন ভবিষ্যদ্বাণীর শব্দাবলীকে বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে ভবিষ্যদ্বাণীই হাত ছাড়া হয়ে পড়ে, তখন তারা লম্বা হাত দ্বারা ত্যাগ ও সদ্‌কা-খয়রাতের সদগুণ বলে অর্থ গ্রহণ করলেন। কিন্তু আমাদের যুগের আলেমগণ জোরালো যুক্তি-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কোনো হাদীসের বাহ্যিক অর্থকে ত্যাগ করতে লজ্জাবোধ করেন। ইবনে-মরিয়ম দ্বারা রূহানীভাবে ইবনে-মরিয়মের প্রতীক বা প্রতিচ্ছবি বলে অর্থ গ্রহণ করতে এবং ‘এক চোখবিশিষ্ট দাজ্জাল’ দ্বারা রূহানীভাবে এক চোখ হওয়া বুঝায় বলে তা’বীর বা ব্যাখ্যা করে পবিত্র কুরআনের অস্বীকার থেকে নিজেকে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক বলে মনে করতেও লজ্জাবোধ করেন। তারা ভেবে দেখেন না যে, ‘ইবনে-মরিয়ম’ ও ‘এক চোখ’ শব্দগুলো যেমন মাহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখঃনিসৃত, তেমনি ‘লম্বা হাত’ শব্দাবলীও তাঁরই মুখঃনিসৃত। বরং ‘হাত’ দ্বারা দৈহিক ও বাহ্যিক হাত হওয়ার সম্পর্কে তো মহানবী (সা.)-এর সম্মুখেই পবিত্র বিবিগণ (রা.) তাঁদের হাতও মেপে ছিলেন। হযরত সওদা (রা.)-এর হাত সবার চেয়ে লম্বা সাব্যস্ত হয়েছিল। আর এমনটিই প্রতীয়মান হয়েছিল যে, অন্য সবার আগে সওদা (রা.) মৃত্যুবরণ করবেন। কেননা মাহানবী (সা.) হাত মাপতে দেখে তাঁদের নিষেধ করেন নি। এতে করে সর্বসম্মতভাবে হযরত সওদা মারা যাবেন বলে বিশ্বাস পোষণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরিশেষে (হযরত জয়নব মৃত্যুবরণ করলে) উল্লিখিত বাহ্যিক অর্থ সহীহ্ ও সঠিক সাব্যস্ত হয় নি।

সাম্প্রতিককালের উলামা যদি একটু চিন্তা করেন এবং ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দৃষ্টিপাত করে আদমের যুগ থেকে আজ অবধি ছয় হাজার বছর অতিবাহিত সময়কালটিতে সত্যধর্মের মোকাবিলায় যে পরিমাণ নৈরাজ্য সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর সাথে যদি সাম্প্রতিককালের নৈরাজ্য ও প্রচেষ্টাগুলো তুলনা করেন তাহলে তাদের নিজেদেরই স্বীকার করতে হবে, প্রকৃত সত্যের সঙ্গে মিথ্যা মিশানোর উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ পরিকল্পিত নৈরাজ্য এই খ্রিষ্টান জাতির দিক থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং সংঘটিত হয়ে চলছে এর কোটিতম অংশও অন্য কোন জাতির দিক থেকে কখনো হয় নি। যদিও অন্যায় রক্তপাতকারী, বই-পুস্তক অগ্নিস্যাতকারী এবং সত্যপরায়ণদের কারারুদ্ধকারী বিপুল সংখ্যক লোক গত হয়েছে, কিন্তু তাদের নৈরাজ্য মানব হৃদয়গুলোকে ওলট-পালট ও বিপর্যস্ত করতে পারে নি, বরং মু’মিনগণ দুঃখ-বেদনা ও নির্যাতন সয়ে ‘ইসতেকামাত’ বা দৃঢ়চিত্ততায় অধিকতর উন্নতি করেছেন। কিন্তু এই লোকদের ফিৎনা ও নৈরাজ্য এবং ঈমানকে ভিত্তিহীন সন্দেহাবলী দ্বারা পবিত্রতা বিনষ্টকারী তথা ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসকে বিকারগ্রস্ত করার জন্য প্রাণঘাতী বিষের প্রভাব রাখে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যে জাতি ছয়কোটি সংখ্যক বই-পুস্তক সন্দেহ ছড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বিতরণ করেছে এবং ভবিষ্যতেও অত্যন্ত তৎপরতার সাথে এ কার্যক্রম অব্যহত রয়েছে, এই জাতির মোকাবেলায় কোন যুগে এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না বরং ছয় হাজার

বছর জুড়ে সময়কালে দৃষ্টিপাতে এর কোনো নজির উদ্ভব হয় নি। তা সত্ত্বেও কি এখনও পবিত্র হাদীসের উদ্দেশ্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় নি যে, এ লোকদের ফিৎনা ও নৈরাজ্য নযিরবিহীন! বিশাল এই যুগ ও সময়কাল পরিশেষে যে মারাত্মক নৈরাজ্য প্রকাশমান সেটি এ ফিৎনাই বটে, যা লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে গির্জাগুলোতে বসিয়ে দিয়েছে। কোটি কোটি পুস্তক ইসলাম ধর্ম খণ্ডনে প্রণীত হয়েছে। অতএব, উল্লিখিত এই বর্তমান ফিৎনাকে 'এখনও কিছুই হয় নি বা ঘটে নি' বলে মনে করা ঐ মৌলবীদেরই কাজ যাদের অন্তরে আদৌ এই ধারণা নেই যে তারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে নিক!!

কিছু নির্বোধ মৌলবী-মওলানা জেরাস্বরূপ এ আপত্তি পেশ করেন যে, মরিয়মপুত্র মসীহ্ (আ.) দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং 'আহলে-কিতাব' (তথা ইহুদীরা) সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এ ধারণার সমর্থনে তারা এ আয়াত পেশ করেন : **"ওয়া ইন্ মিন আহ্‌লিল-কিতাবি ইল্লা লা-ইউমিনান্না বিহি"** *(সূরা নিসা : ১৬০)*। আমি বলছি উক্ত আয়াতের যদি এ অর্থই হয়ে থাকে যে মসীহ্‌র অবতরণকালে ইহুদীরা সবাই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে তাহলে আমরা কখনও একথা বলতে পারি না যে দাজ্জালকে তিনি কুফরী অবস্থাতেই হত্যা করবেন। তাছাড়াও, 'মুসলিম' বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টতঃ লেখা আছে, 'দাজ্জালের সাথে সত্তর (৭০) হাজার সংখ্যক ইহুদী যোগ দেবে (তার দলভুক্ত হবে)। আর তাদের অধিকাংশ কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে এবং মসীহ্ (আ.)-এর মৃত্যুবরণ করার পরও অধিকাংশ লোক কাফির ও বে-দীন অবস্থায় থেকে যাবে এবং তাদের ওপর কিয়ামত সংঘটিত হবে।' তদুপরি, কুরআন করীমও সুস্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাষায় এর সত্যায়ণ ও সাক্ষ্য প্রদান করে:

وَ جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۚ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)*

অর্থাৎ 'আমি তোমার অস্বীকারকারীদের ওপর তোমার অনুসারীদের কিয়ামত দিবস অবধি প্রাধান্য দান করব'– অনুবাদক। অতএব, এতে করে স্পষ্টতঃ জানা গেল যে কিয়ামতকাল অবধি ইহুদীদের প্রজন্ম অল্প-বিস্তর অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ্ তা'লা আরও বলেন:

فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ *(সূরা আল্ মায়েদা: ১৬)*

'আমরা তাদের (ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের) মাঝে কিয়ামত দিবস অবধি শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়েছি।' এ আয়াতটিতেও স্পষ্টতঃ প্রমাণিত যে, ইহুদীরা কিয়ামতকাল অবধি অবশিষ্ট থাকবে। কেননা, তারা যদি ইতোঃপূর্বেই হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ঈমান আনে তা'হলে তাদের মধ্যকার উল্লিখিত শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের ধারা কিয়ামত দিবস অবধি বিস্তৃত হবে– তা কীভাবে সম্ভব?! অতএব মানতে হয়, এরকম ধারণা যে হযরত মসীহ্‌র অবতীর্ণ হওয়ার আলামত বা চিহ্ন হল– সকল আহলে-কিতাব (ইহুদী) তাঁর প্রতি ঈমান আনবে– এটা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী।... *(চলবে)*

ভাষান্তর:

মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

মুরব্বি সিলসিলাহ্ (অবঃ)

কৃতী-ছাত্রী

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের কনিষ্ঠ কন্যা শিফা সামিয়াত ২০২০ সালের এস, এস, সি পরীক্ষায় YWCA স্কুল থেকে GPA-5 (A+) পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। পূর্বেও সে জে, এস, সি পরীক্ষায় একই স্কুল থেকে GPA-5 (Golden A+) এবং বৃত্তি পেয়েছিল। জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির কাছে আমাদের মেয়ের শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং আধ্যাত্মিক ও জাগতিক তথা সুস্বাস্থ্যের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি। উল্লেখ্য সে ১৬৮ পূর্ব রাজা বাজার নিবাসী ডা. আব্দুর রশীদ সাহেবের নাতনি এবং মিরপুর সাংবাদিক এলাকার মরহুম সৈয়দ আবদুল কাহহার সাহেবের দৌহিত্রা।

মোহাম্মদ আবদুস সালাম ও সৈয়দা ফারহানা আহমেদ

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, মোতাবেক ১২ তবলীগ ১৩৯৫ হিজরী শামসী'র

জুমুআর খুতবা

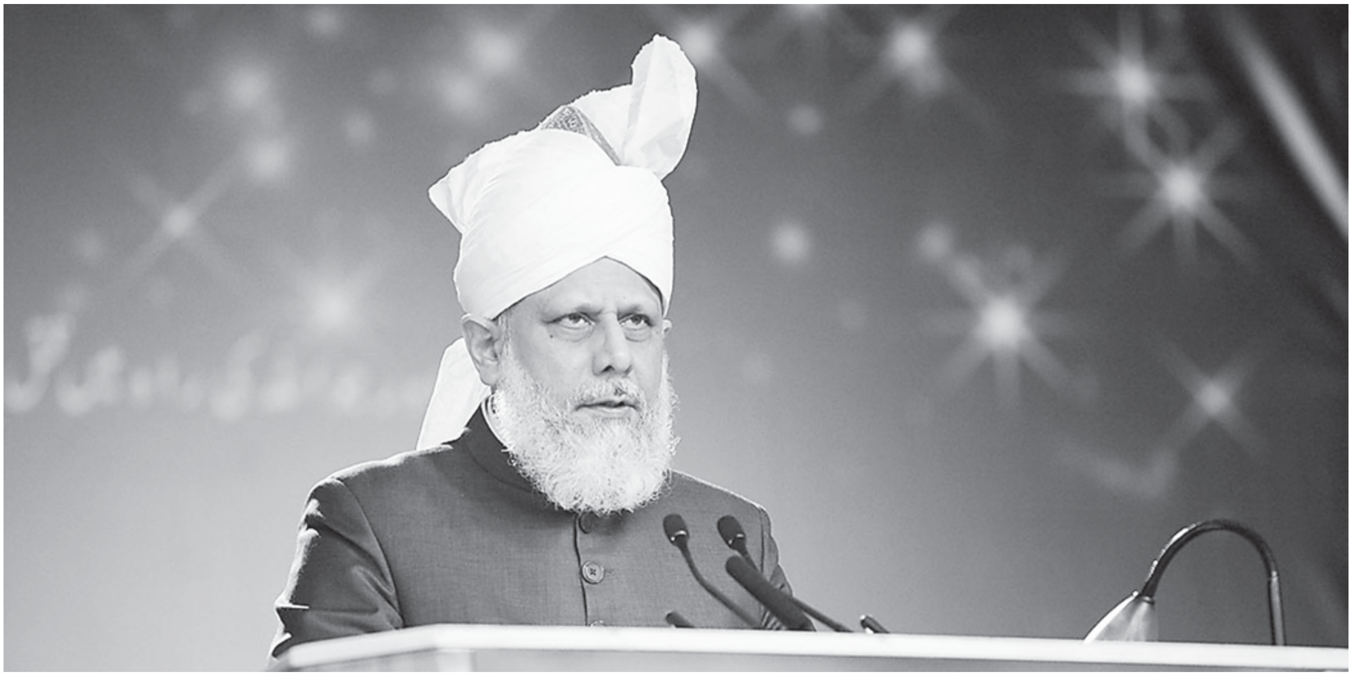

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবা ও বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষণীয় কথা এবং গল্প-কাহিনী তুলে ধরেন। আমি বিভিন্ন সময় সেগুলো উপস্থাপন করে আসছি। আজও তা-ই করব।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক খুতবায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, "খোদা তা'লা যখন নিজের পক্ষ থেকে কাউকে দণ্ডায়মান করেন অথবা নবীদের প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য-সমর্থনও করে থাকেন, আর সত্য প্রকাশার্থে যদি পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকেও তাদের অপকর্মের জন্য শাস্তি দিতে চান তাহলে (তা করতে) ভ্রুক্ষেপ করেন না এবং শাস্তি দেন। এই প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করে তিনি (রা.) বলেন, শৈশবে আমাদের গল্প শোনার সুগভীর আগ্রহ ছিল। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের এমন সব গল্প শোনাতেন যা শুনে শিক্ষা লাভ হয়। (এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন) সেসব কাহিনীর মাঝে একটি কাহিনী এখন আমার মনে পড়ছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখে আমি শুনেছি। তিনি (আ.) বলতেন, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগে এ কারণে প্লাবন এসেছিল যে, মানুষ তখন চরম নোংরামিতে নিমজ্জিত ছিল আর পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের পাপের মাত্রা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছিল আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তাদের মূল্যও ততই হারিয়ে যেতে থাকে। কাহিনী হল, কোন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ ছিল। সেখানে পাখির বাসায় একদিন একটি চড়ুই ছানা বসে ছিল। সেই ছানার মা কোন জায়গায় গিয়ে আর ফিরে আসতে পারে নি। হয়তো মারা গিয়ে থাকবে বা অন্য কোন কারণে তার ফিরে আসা হয় নি। পরবর্তীতে সেই চড়ুই ছানার পিপাসা লাগে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে নিজের মুখ খুলতে থাকে। এটি দেখে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দেন যে, যাও এবং পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ

কর, আর এত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ কর যেন সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৃক্ষস্থ পাখির বাসা পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়, যাতে সেই চড়ুই ছানা পানি পান করতে পারে। ফিরিশ্‌তারা বলে, হে আল্লাহ্! সে পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে গেলে সারা পৃথিবীই তলিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দেন, আমি কোন ভ্রুক্ষেপ করি না, এখন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের ততটাও মূল্য নেই যতটা এই চড়ুই ছানার মূল্য রয়েছে।" *(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭শ খণ্ড, পৃ: ৬৭৮-৬৭৯)*

অতএব যদিও এটি একটি কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীর শিক্ষণীয় দিক হল, সত্য এবং সততা বিবর্জিত গোটা বিশ্বের সবাই সম্মিলিতভাবেও খোদার দৃষ্টিতে এক চড়ুই ছানার সমান মর্যাদাও রাখে না।

অতএব আজ এই কাহিনী থেকে আমরা যেখানে এই শিক্ষা লাভ করি যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত, সেখানে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসাও করা উচিত যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছি ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিবতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য, নিজেদের অভ্যন্তরীণ পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্য এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য। কিন্তু কালের প্রবাহে আমাদের অবস্থায় উন্নতির পরিবর্তে যদি অবনতি হয় তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। এমন পরিস্থিতিতে খোদাও আমাদের প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

অনুরূপভাবে আজ পৃথিবীর অবস্থা কোন দিকে যাচ্ছে, এ কথাও কারো অজানা নয়। বহু দেশে সরকার এবং জনসাধারণের কেউই পরস্পরের প্রাপ্য প্রদান করছে না। অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে। যেখানে বাহ্যত অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা যায় না বা অবস্থা খুব বেশি খারাপ প্রতিয়মান হয় না সেখানেও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে মানুষ শুধু খোদা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না বরং খোদা তা'লার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে এবং অপলাপ করে তাঁর অবমাননার চেষ্টা করা হচ্ছে, একই সাথে নোংরামিতেও তারা এতটাই তলিয়ে যাচ্ছে যে, (চরিত্র বিধ্বংসী) অস্বাভাবিক কার্যকলাপকে আইন পাশ করে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বরং বলা হয়, যারা এসব নোংরা কাজের সমর্থন করে না তারা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে অপরাধী। এসব ভূমিকম্প, ঝড়-তুফান, নৈরাজ্য এবং প্রবল বর্ষণ– যা ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে রেখেছে এর কারণ হল, পাপ চরম রূপ ধারণ করেছে। এটি কেবল সতর্ক-সংকেত মাত্র যা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সাবধান করছেন। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করার এবং একথা বলার গুরুভার আহমদীদের স্কন্ধেই বর্তায় যে, তারা যদি নিজেদের সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা অনেক ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযিল করতে পারেন। পৃথিবীবাসী সম্বিত ফিরে পাক–আল্লাহ্‌র কাছে এ দোয়াই করি।

আজ-কালকার বিষয়াদির মাঝে একটি বিষয় আমরা দেখি যে, পৃথিবীতে নিজের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা হয়, এর ফলে অন্যের যত ক্ষতিই হোক না কেন; অবশ্য আদি থেকেই এটি হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুসলমানের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত? একটি ঘটনা এ বিষয়ে সর্বোত্তম পথের দিশারী।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শোনাতেন যে, একজন সাহাবী নিজের ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য একজন সাহাবীর কাছে নিয়ে যান আর এর মূল্য (দৃষ্টান্তস্বরূপ) দু'শত রুপি নির্ধারণ করেন। দ্বিতীয় সাহাবী তখন বলেন, আমি এই মূল্যে ঘোড়া ক্রয় করতে পারি না কেননা এর মূল্য দ্বিগুণ। সেই সাহাবী বিক্রেতা সাহাবীকে বলেন, ঘোড়ার বাজার দর সম্পর্কে আপনি মনে হয় অবহিত নন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক সাহাবী অধিক মূল্য নিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমার ঘোড়া যেহেতু বেশি মূল্যের নয় তাই আমি কেন অধিক মূল্য গ্রহণ করবো? আর এটি নিয়ে তাদের মাঝে বচসা-বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে তারা সালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করান। এটি ছিল ইসলামিক চেতনা এবং প্রেরণা যা এই দু'জন সাহাবী প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা হল, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নিজের অধিকার নেয়া এবং এর জন্য নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদান এবং তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। [(সে যুগে কোন কোন ক্ষেত্রে হরতাল বা ধর্মঘট চলছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন)] এই চেতনাবোধ জাগ্রত হলে সকল হরতাল বা ধর্মঘট আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু নূন্যতম পুণ্য হল, কারো পক্ষ থেকে যখন অধিকার দাবী করা হয় তখন সেটি যদি তার প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে তা প্রদান করা। এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকার যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করে আছি, তা ভোগ করছি আর একে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে তাই অন্যকে আমরা সেই প্রাপ্য দিতে পারি না। *(খুতবাতে মাহমুদ, ১৭শ খণ্ড, পৃ: ১৩৭)*

এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত একটি রীতি যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী।

উদাহরণস্বরূপ আজকালকার উন্নত বিশ্বেও হরতাল বা ধর্মঘটের যে অধিকার দেয়া হয়েছে, তা একটি অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্ত। তারা এই চিন্তা করে না যে, এর সীমারেখা কী হওয়া উচিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে আজকাল জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে যার ফলে রোগীরা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য রোগীদের শুধু চিকিৎসা-সুবিধার অধিকার থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এবারকার জাপান সফরের সময় খুবই ভদ্র একজন খ্রিষ্টান পাদ্রি আমাকে প্রশ্ন করেন যে, শান্তির সংজ্ঞা কী? কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? তিনি বলেন, আজ পর্যন্ত আমি এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাই নি যে,

শান্তির সংজ্ঞা কী। তখন আমি তাকে বললাম, যা আমি পূর্বেও বলেছি যে, ইসলাম বলে- যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। যদি এমনটি কর তাহলে তাহবে পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নামান্তর। আর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে শান্তি আসবে। এভাবে তোমরা পরস্পরের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। তিনি বলেন, এই সংজ্ঞা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে যা আমি প্রথমবার শুনেছি।

অতএব আজ কেবল ইসলামই সকল বিষয়ে সঠিক পথপ্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছাড়া আমরা জগদ্বাসীকে কোনভাবেই মানাতে সক্ষম হব না। অন্যের অবৈধ অধিকার আদায়ের তো প্রশ্নই উঠে না, আমরা যদি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিজেদের বৈধ অধিকারও ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই তাহলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা যদি বৈধ অধিকারও ছেড়ে দেই তাহলে কিছুই যায় আসে না। যখন এমনটি হবে, যেহেতু এক সমাজে উভয় পক্ষ থেকে অধিকার প্রদানের চেষ্টা থাকবে অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষও যদি মু'মিন হয় তাহলে সে-ও অন্যায় অধিকার চাইবে না। এটি হতেই পারে না যে, সে অবৈধভাবে অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, অনেক সময় আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে এমন অনেক মামলা আসে অর্থাৎ আমাদের জামা'তেও ভাই-ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা আত্মীয়স্বজনের অধিকারকে কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগেরও অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের জন্য ইসলাম আমাদের কী শিক্ষা দেয় আর সাহাবীদের কেমন আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে? ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, একবার হযরত ইমাম হাসান এবং ইমাম হোসেন (রা.)-এর মাঝে কোন বিষয়ে তর্ক হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় মনোমালিন্য হয়েই থাকে বা বিতর্ক হয়ে যায়। প্রকৃতিগতভাবে হযরত ইমাম হাসান খুবই শালীন ও কোমলমতী ছিলেন কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন-এর স্বভাবে আবেগপ্রবণতা ছিল। তাদের মাঝে যে বাগ্‌বিতণ্ডা বা ঝগড়া হয় তাতে হযরত ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে অধিক কঠোরতা প্রদর্শিত হয় কিন্তু হযরত ইমাম হাসান ধৈর্য প্রদর্শন করেন। সেই বাগ্‌বিতণ্ডার সময় আরো কতিপয় সাহাবী অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঝগড়া শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী দিন একজন দেখেন যে, হযরত ইমাম হাসান খুব দ্রুত হেটে কোন দিকে যাচ্ছেন। সেই ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ইমাম হাসান বলেন, আমি হোসেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলে, আপনি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন? ঝগড়ার সময় আমি নিজে অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম আর আমি জানি যে, হযরত হোসেন আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। তাই আপনার তার কাছে নয় বরং তার আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত হাসান বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন, তিনি আমার সাথে কঠোর হয়েছেন, কিন্তু আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি এজন্য যে, এক সাহাবী আমাকে বলেছেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, দু'জনের মাঝে যখন ঝগড়া হয় তখন তাদের মাঝে যে প্রথমে মীমাংসার হাত বাড়ায় সে দ্বিতীয় জনের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি শুনে আমার হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয় যে, গতকাল আমি হোসেনের কঠোর কথার সম্মুখীন হয়েছি, তিনি আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। এখন যদি হোসেন আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে এসে যান আর মীমাংসা করে নেন তাহলে উভয় জগতেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম, কেননা এখানেও আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হল আর পরকালেও আমি পিছিয়ে থাকলাম। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার সাথে যে কঠোর ব্যবহার করা হয়েছে তা-তো হয়েই গেছে, এখন আমি তার কাছে আগে ক্ষমা চেয়ে নিব যেন এর বিনিময়ে অন্ততপক্ষে তার পাঁচশ' বছর পূর্বে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি। *(আল ফযল, ২৩ মে ১৯৪৪, পৃ:৪, কলাম: ২-৩, ৩২শ খণ্ড, সংখ্যা: ১১৯)*

অতএব এটি হল সেই মনমানসিকতা যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি করা উচিত বা জাগ্রত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি কৌতুক শুনেছি যা হয়ত মাকামাতে হারীরি বা অন্য কোন গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে। তিনি (আ.) বলতেন, একজন মেহমান কোন জায়গায় গোসল করতে যান। হামামের মালিক অতিথিদের সেবার জন্য বিভিন্ন চাকর-বাকর নিয়োজিত রেখেছিলেন। কোন কোন দেশে এমন হামাম বা স্নানাগার থাকে যেখানে সেবকও থেকে থাকে যারা অতিথিদের মালিশ করে এবং গোসল করায়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে তখন হামামের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিল না। মেহমান যখন গোসল করার জন্য হামামে প্রবেশ করে তখন সব সেবক একসাথে এসে তার সাথে চিমটে যায়। আর যেহেতু মাথা সহজেই মালিশ করা সম্ভব তাই সবাই একসাথে তার মাথা মালিশ করতে আরম্ভ করে। একজন বলে, এটি আমার মাথা, দ্বিতীয় জন বলে, তা আমার মাথা। যার ফলে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায় আর একজন আরেকজনকে ছুরি মারে, ফলে সে আহত হয়ে পড়ে। হইচই-এর ফলে পুলিশও এসে যায় আর বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতেও একজন চাকর বলে, এটি আমার মাথা আর দ্বিতীয় জন বলে, এটি আমার মাথা। যে গোসল করতে গিয়েছিল আদালত তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, হুযূর! এরা হল মাথাবিহীন, বোকা। এদের কথা শুনে আমি অবাক হই নি, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আপনিও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন! অথচ মাথা এরও নয় আর ওরও নয়, মাথা হল আমার।

ইহজাগতিক ঝগড়া-বিবাদ অসার হয়ে থাকে, তা বোঝানোর জন্য হযরত মসীহ্

মাওউদ (আ.) এই দৃষ্টান্ত দিতেন। আমার কী আর তোমারই বা কী, গোলাম বা দাস কোন কিছুর মালিক নয়, সে যখন বলে যে, আমি আবদুল্লাহ্, তখন এর অর্থ হল, এখন কোন কিছুই তার নিজের নয়। একজন প্রকৃত মুসলমান সম্পর্কে কথা হচ্ছে আর এ ঘটনা এই প্রেক্ষাপটেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে, সে আমার বা তোমার প্রশ্ন করে না, সে তো খোদার বান্দা হয়ে থাকে। যখন সে বলে যে, আমি আব্দুল্লাহ্ তখন তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না। সবকিছু খোদা তা'লার। সে যখন প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, তখন সে বলে যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র। এরপর আর এই প্রশ্ন বাকি থাকে না যে কোনটি আমার আর কোনটি তোমার।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করে দেখ! এতে মহানবী (সা.)-এর নামও আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়েছে 'لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ' *(সূরা আল্ জিন্ন: ২০)*।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে আমাদের নিজেদের আর কিছুই থাকে না বরং সব কিছুই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমরা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছি। এখানে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সবাই প্রাণ শব্দের অধীনে চলে আসে আর বাকি সমস্ত ধনসম্পদ 'মাল' শব্দের অধীনে এসে যায়। আর মানুষ এই দু'প্রকার জিনিসেরই মালিক বা স্বত্বাধিকারী হয়ে থাকে। আর আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, আমরা এই উভয় জিনিস মানুষের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি, তাদের প্রাণও নিয়েছি আর তাদের সম্পদও। এর অর্থ হল, তোমাদের মাঝে এ মর্মে ঝগড়া-বিবাদ থাকা উচিত নয় যে, এই জিনিসটি আমার বা সেই জিনিসটি তার, এই বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ো না। এখানে আমার বা তোমার বলার কোন সুযোগ নেই। তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা কর আর এসব বিতর্ক ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট হলেন। (এখানে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, পদধারীদের কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই এই ঝগড়া আরম্ভ করে যে, অমুক ব্যক্তি কেন নামাযের ইমাম নিযুক্ত হল, আমরা তার পিছনে নামায পড়ব না।) অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হল, অমুক কেন হয় নি? অমুক কেন সেক্রেটারী মনোনীত হল, সে কেন হল না, অথবা যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি ইমাম না হবেন আমরা অমুকের পিছনে নামায পড়তে পারি না। *(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৬, পৃ: ২৭০-২৭১)*

এ কথাগুলো কেবল শোনার জন্য নয়। কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে এমন মানুষ ছিল, বর্তমান যুগে এমন মানুষ আর নেই। আজও এমন অভিযোগ এসে থাকে। সে যুগে সাহাবীরাও জীবিত ছিলেন যারা এমন বক্র প্রকৃতির লোকদের সংশোধন করতেন। কিন্তু আমরা নবুওয়্যাতের যুগ বা নবীর যুগ থেকে ক্রমশ দূরে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে আরো দূরে যেতে থাকব। তাই এযুগে এদিকে আমাদের সজাগ দৃষ্টি দেয়া উচিত। পূর্বেও এ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আমাদের অনেক সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের এ কথা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি এবং কীভাবে নিজেদের হঠকারিতা ও আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি? নির্বাচনের সময়ও এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে। কোন কোন সময় অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্ন পাঠাতে থাকে। এ বছরটিও নির্বাচনের বছর। জামা'তগুলোতে এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সকলের উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। অর্থাৎ দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের অধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করুন, নিজের পরামর্শ দিন, আর এরপর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। সম্পূর্ণরূপে নিজের আমিত্ব বা স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র আসে যে, অমুককে কেন মনোনীত করা হল, অমুককে কেন করা হল না, ইনি এমন আর তিনি তেমন। অতএব এমন আজেবাজে চিন্তাধারা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত। আর যাকেই যতদিনের জন্য নিযুক্ত করা হয় ততদিন অবশ্যই তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, একটি কথা হল, মু'মিনের উচিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করা এবং বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে। আর অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহদাদার হোক তারা যেন কেবল স্বীয় অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করে বরং নিজেরাও যেন সরাসরি সব কাজের নিগরানী বা তত্ত্বাবধান করে এবং কাজে অংশগ্রহণের চেষ্টা করে। তাহলেই সঠিকভাবে কাজ সমাধা হতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার বিশাল এক লঙ্গরখানা ছিল যাতে বহু সংখ্যক গরীব-দুস্থ প্রতিদিন খাবার খেত। কিন্তু বিশৃঙ্খলা ছিল এর সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা। সে ব্যক্তি সম্পদশালী ছিল, তার মাঝে নিগরানী বা দেখাশুনার মনমানসিকতা ছিল না, সেদিকে দৃষ্টি দিত না। আর কর্মচারীরা ছিল অসৎ ও দুর্নীতিবাজ। যারা বাজার করতো তারা বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করতো আর পরিমাণে আনতো কম। ব্যবহারকারীরা কিছুটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। যারা খাবার রান্না করতো তারা কিছুটা নিজেরা খেয়ে ফেলতো, কিছু

আত্মীয়স্বজনকে খাইয়ে দিত আর কিছু এদিক-সেদিক নষ্ট করতো। একইভাবে স্টোররুম খোলা থাকতো আর সারা রাত কুকুর এবং শিয়াল ইত্যাদি সেসব খাদ্যসামগ্রী খেতো এবং নষ্ট করতো। ফলশ্রুতিতে সেই ব্যক্তি অনেকটা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে আর বিশ বছরের অব্যবস্থার পর তাকে জানানো হয় যে, তুমি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছ। সে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে উদার ছিল তাই সে লঙ্গরখানা বন্ধ করতে চায় নি কিন্তু একইসাথে ঋণ পরিশোধের চিন্তাও তার ছিল। সে তার বন্ধুবান্ধবদের ডাকে এবং তাদের সবাইকে বলে যে, আমি ঋণে জর্জরিত, নিজের দোষ-ক্রুটির কথা সে কিছুই বলে নি আর কেউ বলেও না। তারা সবাই বলে যে, স্টোররুমের কোন দরজা নেই, সারারাত শিয়াল-কুকুর ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী নষ্ট করতে থাকে, তাই অনেক জিনিস নষ্ট হয়। স্টোরে যদি দরজা লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হতে পারে। সে দরজা লাগানোর নির্দেশ দেয় আর দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি কাহিনি মাত্র আর কাহিনীতে কুকুর-শিয়াল এবং অন্যান্য প্রাণীরাও কথা বলে থাকে। তিনি বলেন, রাতের বেলা শিয়াল এবং কুকুরেরা স্টোররুমের দরজা বন্ধ পেয়ে অনেক হইচই বা হট্টগোল করে। হঠাৎ এক বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কুকুর বা শিয়াল সেখানে আসে আর জিজ্ঞেস করে, তোমরা কেন হইচই করছ? অন্যরা উত্তর দেয়, স্টোররুমে দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়েছে, এখন আমরা খাব কোত্থেকে? আমাদের এলাকার সব কুকুর ও শিয়াল এখান থেকেই খাবার খেতো। সে বলে যে, তোমরা অনর্থক কান্নাকাটি এবং হইচই করছো আর নিজেদের সময় নষ্ট করছো। যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত নিজের ঘর লুটপাট হতে দেখেছে এবং এর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয় নি তার স্টোরের দরজা কে বন্ধ করবে? সে নিজে তো আর এর তত্ত্বাবধান করবে না। তাই চিন্তা করো না।

সুতরাং এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, 'যদি চায়' এবং 'চায়'-এর মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। কুকুর এবং খেকশিয়ালরা হইচই করে যে, সে 'যদি চায়' আর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে আমরা খাব কোত্থেকে? আর তাদের যে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ নেতা ছিল সে বলে যে, সে অর্থাৎ সেই সম্পদশালী ব্যক্তি চাইবেই না। সে এদিকে মনোযোগই দিবে না, তাই হইচই করার কী প্রয়োজন? এটি বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামা'তের সদস্যরা যদি না-ই বা চায় তাহলে কিছু হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তারা যদি চায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও স্বল্পতম সময়ে সমাধা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের শৈশবের বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে আলাদিনের প্রদীপের কাহিনী অনেক প্রসিদ্ধ ছিল। আলাদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, তার একটি প্রদীপ হস্তগত হয়। সে যখনই সেই প্রদীপে ঘর্ষণ করত এক দৈত্য সামনে আসত। (এটি শিশুদের একটি কাহিনী বানানো হয়েছে।) সেই দৈত্যকে সে যা-ই বলত সে তাৎক্ষণিকভাবে তা প্রস্তুত করে তার সামনে হাজির করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে তাকে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলে সে নিমিষেই রাজ প্রাসাদ তৈরি করে দিত। তিনি (রা.) বলেন, শৈশবে যখন বিচারবুদ্ধি ছিল না তখন আমরা মনে করতাম, আলাদিনের প্রদীপের ঘটনা একটি সত্য ঘটনা। কিন্তু বড় হলে আমরা বুঝতে পারি যে, এটি শুধু একটি ধারণা এবং কল্পকাহিনী। কিন্তু এরপর যৌবন পেরিয়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলাম তখন বুঝতে পারলাম, এই কথা সঠিক। [(এখানে যারা বসে আছে তারা হয়ত আশ্চর্য হচ্ছে যে, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন যে, বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে জানতে পারলাম এ কথা সঠিক।)] আলাদিনের প্রদীপ অবশ্যই রয়েছে। তিনি বলেন, কিন্তু সেই প্রদীপ তেলের প্রদীপ নয় বরং তা দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ। খোদা তা'লা যাকে সেই প্রদীপ দান করেন, সে সেই প্রদীপকে কাজে লাগায়, একারণে যে সংকল্প এবং প্রত্যয় খোদা তা'লার গুণাবলীর অন্তর্গত বিষয়। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে 'কুন' বললে কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে তাঁর নির্ধারিত নীতির অধীনে তাঁর নির্দেশাবলী মান্য করে, (স্মরণ রাখবেন এগুলো হল শর্ত) তাঁর কাছে দোয়া করা এবং সাহায্য যাচনার মাধ্যমে কোন মানুষ যদি 'কুন' বা হও বলে তাহলে তা হয়ে যায়। এক কথায় শৈশবে আমরা আলাদিনের প্রদীপের কথা বিশ্বাস করতাম। যৌবনে আমাদের সেই ধারণা দোদুল্যমান হয়ে পড়ে কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর বুঝতে পেরেছি যে, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনী সত্য। কিন্তু এটি একটি রূপক ঘটনা আর সেই প্রদীপ পিতলের নয় বরং তা সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ। যখন তাতে ঘর্ষণ করা হয় তখন কাজ যত বড়ই হোক না কেন তা স্বল্পতম সময়ে হয়ে যায়। *(আল ফযল, ২৪ জানুয়ারি ১৯৬২, পৃ: ২-৩, খণ্ড: ৫১/১৬, সংখ্যা: ২০)*

অতএব এটিই আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা হওয়া উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র 'যদি চাই' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকব না বরং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে চাইতে হবে আর চাওয়ার পাশাপাশি নিজেদের সকল শক্তিসামর্থ্য ব্যয়ে সেই কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা চায়ও কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বা চাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন কাজ হয় না কেননা তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। সেই চাওয়ার সাথে সেই সমস্ত অনুসঙ্গ যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থাকে না, অর্থাৎ সংকল্প থাকে না, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে করা হয় যে, আমরা চাই।

এই বিষয়টি আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করি যখন নামাযের প্রশ্ন আসে। অনেকেই আমার কাছে এসে বলে, দোয়া করুন, আমরা নিয়মিত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা নিয়মিত নামায পড়তে পারি না। অন্যান্য কাজ করার ইচ্ছা হলে করে ফেলে, কিন্তু নামাযকে যেহেতু অনিহার সাথে চায়, এর জন্য নিজেদের সকল

শক্তিসামর্থ্য নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না, তাই নামাযের অভ্যাসও গড়ে উঠে না। এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। এটি হতেই পারে না যে, মানুষের চাওয়া সত্ত্বেও কোন কাজ হবে না। নামায সত্যিকার অর্থে তাদের কাছে একটি গৌণ বিষয় হয়ে থাকে। তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক কাজ, যা একটি ভ্রান্ত রীতি। তাই সেই চাওয়া অনুসারে কাজ হয় না। এটি কীভাবে সম্ভব যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে, তার জন্য দৃঢ় প্রত্যয় থাকবে আর কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও করবে অথচ সে কাজ হবে না? অতএব এটি মানুষের নিজের আলস্য ও অনিহা হয়ে থাকে যাকে বিনা কারণে চাওয়া আখ্যা দেয়া হয়।

একটি ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে তিনি (রা.) বলেন, আমরা শৈশবে একটি গল্প শুনতাম আর শুনে হাসতাম; অথচ হাসির জন্য নয় বরং ক্রন্দনের জন্য সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছিল। তাতে বর্তমান যুগের মুসলমানদের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। কিন্তু সেই কাহিনী যিনি শুনিয়েছেন তিনি ইঙ্গিতে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন যেন মৌলবীরা তার পিছু ধাওয়া না করে। (কোন আহমদীও যদি এমন কাজ করে তাহলে তাকেও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে।) সেই কাহিনীটি হল, কারো এক দাসী বা চাকরানী ছিল যে সেহরীর সময় রীতিমত উঠতো কিন্তু সে রোযা রাখতো না। গৃহকর্ত্রী ভাবলেন, সে হয়ত কাজে সাহায্য করার জন্য ওঠে। কিন্তু সে যেহেতু রোযা রাখতো না তাই গৃহকর্ত্রী চিন্তা করলেন যে, তাকে অনর্থক সেহরীর সময় কষ্ট দেয়ার কী প্রয়োজন। সেই সময়ের কাজ আমি নিজেই করে নিব। দু'চার দিন পর গৃহকর্ত্রী বলেন, তুমি সেহরীর সময় উঠো না, আমি নিজেই এ সময়ের কাজ সেরে নিব, তোমার এই সময়ে কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। এ কথা শুনে সেই মেয়ে বিস্ময়ের সাথে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকায়। (তার চোখে এ প্রশ্ন ছিল যে) আমাকে বলছে কী? আর বলে, বেগম সাহেবা! আমি নামায পড়ি না, রোযাও রাখি না, যদি সেহরীও না খাই তাহলে তো কাফের হয়ে যাব। আসলে এটি প্রতীকি ভাষায় মুসলমানদের অবস্থা (অথবা সেসব লোকের অবস্থা যারা নামাযের প্রতি মনোযোগ দেয় না)। তিনি বলেন, অন্য ভাষায় তুমি এটি বলতে পার যে, যদি কোন মুসলমানকে বলা হয় যে, (এটি জুমুআতুল বিদার প্রেক্ষাপটে বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জুমুআ এবং প্রত্যেক নামাযের ক্ষেত্রেই এই কথাটি প্রযোজ্য) মিঞাঁ! জুমুআতুল বিদা পড়ে কী লাভ। তুমি কেন অযথা নিজেকে এর জন্য কষ্ট দাও? অন্যান্য জুমুআ যেহেতু পড় না, তাই এই জুমুআও পড়ো না। তখন সে বিস্ময়ের সাথে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে, ভাইজান! এটি আপনি কী বলছেন? আমি প্রাত্যহিক নামাযের জন্য মসজিদে যাই না, রোযাও আমি রাখি না, জুমুআতুল বিদাও যদি না পড়ি তাহলে তো কাফের হয়ে যাব। অতএব একবেলা মসজিদে এসে নামায পড়ে মনে করা যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে-এটিও একটি হাস্যকর বিষয়। (অথবা তাদের জন্যও হাস্যকর, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে এক বেলার নামায পড়লেই তার আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট।)
(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ২৩, পৃ: ৪৩৮-৪৩৯)

অতএব যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই দলভুক্ত। পাঁচবেলার নামায প্রত্যেক সুস্থ্য-সাবালক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। আর পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'তের সাথে নামায পড়া আবশ্যক এবং এর ব্যবস্থা থাকা উচিত। যদি এটি বল যে, আমরা সাবালক নই বা আমাদের কোন বিচারবুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু এই উভয় কারণের কোনটি যদি না থাকে তাহলে সব জায়গায় বা সর্বত্র জামা'তের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেই শুনেছি যে, (হুযূরের রচনাবলীতেও এটি বিদ্যমান) কোন বাদশাহ্ বা সম্পদশালী ব্যক্তি যখন কোন স্থানে যায় তার আর্দালী বা পিয়নও সাথে যায়। যে-ই তার সাথে থাকে তার ভেতরে যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আজকালও দেখুন! কোন মন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসলে তাদের প্রটোকল কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষীরা সবাই তার সাথে যায়। তাদের জন্য পৃথক অনুমতি নেয়া হয় না যে, তারাও সাথে আসবে। উদাহরণস্বরূপ ভাইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করেন (সে যুগে ভারতে বা পাকিস্তানে ইংরেজদের রাজত্বকালে সেখানে ভাইসরয় ছিল) তখন গভর্ণরের আর্দালি কোন নিমন্ত্রণ ছাড়াই তার কাছে যাবে আর সেই দাওয়াতে তার নিরাপত্তারক্ষী এবং সেবকরাও যোগ দিবে। তিনি (রা.) বলেন, তাই তোমাদের অবস্থা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন, তোমরা যদি ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর তাহলে তারা যেখানেই যাবে তোমরা তাদের সাথে যাবে। (আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হলে তাঁর ফিরিশ্‌তাদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে তোমরা তাঁর আর্দালি বা চাপরাসিদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তারা যদি মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাহলে তোমরাও তাদের সাথে যাবে। তিনি (রা.) বলেন, অতএব তোমরা এই অসাধারণ শক্তিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর যা খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শক্তি আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পৃক্ত। তোমরা একে দৃঢ় করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের সাথে যত বেশি সম্ভব সম্পর্ক গড়ে তোল যেন তোমরা মানুষের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছার শক্তি অর্জন করতে পার। যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি তোমাদের অর্জন হয়ে যায় তাহলে সকল পর্দা দূরীভূত হবে আর খোদার জ্যোতি যেখানে পৌঁছবে তোমরাও সেখানে পৌঁছে যাবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সেই সময় জলসায় আগমনকারীদের নসীহত করেছিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও আর যে আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছ তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা কর। কুস্তি দেখার জন্য কিছু মানুষ যেভাবে প্রথমে এসে যায় তোমাদের আগমন যেন তদ্রুপ না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ফলে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এই আধ্যাত্মিকতা যখন মানুষের মনমস্তিষ্কে প্রভাব ফেলবে তখন তোমাদের কাজ ফিরিশ্‌তারাই করবে আর যেখানেই তারা পৌঁছবে সেখানে তোমাদের নামও পৌঁছে দিবে, কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য হবে পুত, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তোমরা হবে উন্নত আর তোমাদের কাজ খোদা তা'লার কাজ বলে প্রতিয়মান হবে। *(আল ফযল, ৯ জানুয়ারি ১৯৫৫, পৃ: ৩, কলাম: ১, খণ্ড: ৪৪/৯, সংখ্যা: ৮)*

অতএব এই মৌলিক নীতিটি সবসময় স্মরণ রাখা উচিত যে, জলসা হোক বা ইজতেমা, আমরা যখন কোন জায়গায় সমবেত হই,, আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য যখন আমরা একত্রিত হই তখন আমাদের তা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। আমাদের বৈঠক বা মজলিসসমূহকে যেন ক্ষণস্থায়ী আধ্যাত্মিক বৈঠক না হয় বরং আধ্যাত্মিক বৈঠক সমূহের যে প্রভাবই রয়েছে, তা যেন স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে আর ফিরিশ্‌তারাও যেন সকল স্থানে আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। অধিকন্তু যেখানেই আমরা চেষ্টা করি সেখানে ফিরিশ্‌তারা এসে যেন প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে।

সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, সে-ই সত্যিকার মু'মিন, যে কোন সৎকাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে বর্ধিত নেক কর্মের সামর্থ্য লাভের জন্য দোয়া করে, যাতে করে এই ধারা অব্যাহত থাকে এবং তার পরিণামও শুভ হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কোন কোন সাহাবী বলেন, মহানবী (সা.)-কে যখন দোয়া করতে দেখতাম তখন আমাদের মনে হতো যেন একটি পাতিলে টগবগ করে পানি ফুটছে। অতএব নিজের নফস বা অবাধ্য প্রবৃত্তির সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর এবং তাকওয়া ও পবিত্রতা অবলম্বন কর। এটি মনে করো না যে, তোমরা নেক কাজ করছ কেননা বড় বড় নেক কর্ম করার পরও ঈমানহীনতা সৃষ্টি হতে পারে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, জানি না কেন আজকাল মানুষ হজ্ব করে আসার পর তাদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং পাপ দানা বাঁধে। এই ত্রুটি দেখা দেয়ার কারণ হল তারা হজ্বের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ বোঝে না। আধ্যাত্মিকভাবে বিন্দুমাত্র লাভবান হওয়ার পরিবর্তে নিরেট হাজী সেজে অহংকার প্রদর্শন আরম্ভ করে। এর পাশাপাশি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি কাহিনী শোনাতেন যে, এক বৃদ্ধা শীতকালে রাতের বেলায় ষ্টেশনে বসে ছিল। কেউ তার চাদর নিয়ে যায়। তার শীত লাগলে চাদর গায়ে দেয়ার ইচ্ছা হয় কিন্তু দেখে যে সেটি নেই। সে চিৎকার করে বলে, ভাই হাজী! আমার শুধু একটিই চাদর, আমার যে সেটি একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, তা আমাকে ফেরত দাও। চাদরটি যে ব্যক্তি নিয়েছিল, সে নিকটেই বসে ছিল, নিয়ে চলে যায় নি। একথা শুনে যে ব্যক্তি চাদরটি চুরি করেছিল সে লজ্জিত হয় আর সেই চাদর তাকে ফেরত দেয়, কিন্তু একই সাথে সে জিজ্ঞেস করে যে, চাদর যে ব্যক্তি চুরি করেছে সে যে একজন হাজী, একথা তুমি কীভাবে জানলে? সেই মহিলা বলেন, এ যুগে এমন পাষণ্ডতা হাজীরাই প্রদর্শন করতে পারে।

অতএব একথা ভেব না যে, আমরা নেক কর্মে নিয়োজিত। একথা মনে করো না যে, আমরা নেক সংকল্প রাখি। মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন, তা থেকে পাপের সূচনা হতে পারে। আর মানুষের ইচ্ছা যতই নেক বা পবিত্র হোক না কেন, তা তার ঈমানকে বিকৃত করতে পারে কেননা ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার দয়ায় লাভ হয়। (এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।) আমাদের আমল বা কর্ম যত বেশিই হোক না কেন, খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে তাহলে ঈমান কোনভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। অতএব সব সময় খোদার দয়ামায়ার ওপর দৃষ্টি রাখ আর তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় তাঁর পবিত্র হাতের দিকে যায়, কেননা যে ভিখারী এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদার দ্বার পরিত্যাগের পর আমার জন্য অন্য কোন দ্বার খুলতে পারে না এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। সুতরাং তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় খোদার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ততক্ষণ তোমরা নিরাপদ থাকবে, কেননা যার চোখ খোদার সত্তায় নিবদ্ধ বা যে খোদার পথপানে চেয়ে থাকে, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। কিন্তু যখনই দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয় আর তাঁর দরজা থেকে মানুষ যদি চলে যায় (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে ইচ্ছা যতই নেক বা পবিত্র হোক আর যত ভালো কাজই করুক না কেন, তার কোন ঠাঁই থাকে না বরং সে শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। *(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ২১৬-২১৮)*

অতএব তওবা, ইস্তেগফার এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যাচনা করা, তাঁর কৃপারাজি ভিক্ষা চাওয়া ও তা আকর্ষণের স্থায়ী চেষ্টা করা- মানুষকে শুভ পরিণাম বা পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে, (আমার সঠিক মনে নেই,) চুরির ঘটনা ঘটে আর তাদের কিছু গহনা চুরি হয়। তাঁর এক চাকর ছিল, সে হইচই করছিল যে, এমনসব দুর্ভাগাও পৃথিবীতে আছে যারা আল্লাহ্‌র খলীফার ঘরে চুরি

করতেও লজ্জা বোধ করে না। চোরকে সেই চাকর অনেক বেশি অভিশাপ দিচ্ছিল আর বলছিল যে, আল্লাহ্ তার চুরি প্রকাশ করুন এবং তাকে লাঞ্ছিত করুন। অবশেষে তদন্ত করে জানা যায় যে, এক ইহুদীর ঘরে সেই গহনা বন্ধক রাখা হয়েছে। সেই ইহুদীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই গহনা তুমি কোথায় পেয়েছ? তখন সে সেই চাকরের কথাই বলে যে অনেক হইচই করছিল আর চোরকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

অতএব অভিশাপ দেয়া বা আনুগত্যের দাবি করা কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হল কর্ম। নতুবা কেবল মৌখিকভাবে আনুগত্যের দাবিদার কোন কোন সময় সবচে বড় মুনাফিক বা কপটাচারীও হতে পারে। *(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ৫১৬)*

অতএব এটি বড় চিন্তার বিষয় আর এদিকে বা এই কথার প্রতি সবসময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় আহমদীয়াতের এক শত্রুর কথা উল্লেখ করেন যে কিনা তাঁর (রা.) সামনে হম্বি-তম্বি করেছিল আর বলেছিল যে, আমরা আহমদীয়াতকে পিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, আমিও তাকে এই উত্তর দিতে পারতাম যে, তুমি পিষ্ট করে তো দেখাও। কিন্তু তা না করে আমি তাকে বলেছি, কাউকে নিশ্চিহ্ন করা বা না করা বা কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা স্থায়িত্ব দেয়া এটি খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে। যদি তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা) আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান তাহলে আপনাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজনই নেই, তিনি নিজেই নিশ্চিহ্ন করে দিবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছু করতে পারবে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আর তাকওয়াই মানুষকে এমনসব দাবি করা থেকে বিরত রাখে যে, হেন করেঙ্গে তেন করেঙ্গে। আমিত্ব বা অহমের কোন মূল্যই নেই। তাকওয়াই প্রকৃত উত্তর বুঝিয়ে দেয়। তাই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছি যে, আমারা কিছু করতে পারব না কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে তোমরা কিছুই করতে পারবে না আর আমাদের কেউ নিশ্চিহ্ন হবে না। তিনি বলেন, তাকওয়াই মানুষকে এমন দাবি থেকে বিরত রাখে যে, আমি হেন করব, তেন করব। এমন দাবি করে লাভ কী?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, কাদিয়ানে বা অন্য কোন স্থানে কলেরার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এক জানাযার সময় একজন বলে বসে যে এরা নিজেরাই ইচ্ছা করে মরে। কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ তবুও পানাহার থেকে বিরত হয় না, আর পেট ভরে খায়। এ কথাও চিন্তা করে না যে, এখন কলেরার সময়। যে ব্যক্তি অনেক বেশি বলছিল, সে বলে, দেখ! আমরা শুধু একটি ছোট চাপাতি খাই। কিন্তু এই হতভাগারা পেটপুরে খেতে থাকে আর এরপর কলেরায় মরতে থাকে। দ্বিতীয় দিন আরো একটি জানাযা আসলে কেউ একজন জিজ্ঞেস করে, এটি কার জানাযা? সেখানকার অনেক মানুষ তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত ছিল। কোন এক মনপোড়া ব্যক্তি বলে বসে যে, এই জানাযা সেই ব্যক্তির যে শুধু একটি চাপাতি খায়। অতএব এমন দাবি করে লাভ কী যে, আমরা এটি করে ফেলব বা সেটি করে ফেলব। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন তা আমরা বলতে পারি যে, এমনটি হয়ে যাবে। বিনয়ের অর্থ এটি নয় যে, খোদা তা'লা যা বলেন তাও গোপন করব। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, 'كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِیۡ' *(সূরা মুজাদেলা: ২২)*

অর্থাৎ আমরা এটি অবধারিত করে রেখেছি যে, আমরা এবং আমাদের রসূলগণ জয়যুক্ত হব। এখন যদি কেউ আমাদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে পিষ্ট করব তাহলে আমি বলতে পারি যে, যদি আমার শক্তির প্রশ্ন হয় তাহলে আমি কিছু বলতে পারব না। কিন্তু এই শব্দ যদি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি কখনো হতে পারে না। আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্। *(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ:৩৪৩)*

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের এত পরিমাণ বিশ্বাস রয়েছে যতটা আমাদের নিজেদের প্রাণের ওপরও নেই। অতএব আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আমাদের জীবদ্দশায় হোক বা পরে, কিন্তু এই বিজয় যাত্রায় শরীক হওয়ার জন্য আমাদের তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা অত্যাবশ্যকীয় যেন বংশপরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর আমাদের যুগে না হলেও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় প্রত্যক্ষকারী হয়।

দোয়া কীভাবে করা উচিত, আর আহমদীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা থেকে উত্তরণ কীভাবে সম্ভব?– এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ সেটিই যা মা তার পুত্রের সাথে বা সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করে। অনেক সময় মায়ের বক্ষের দুধ শুকিয়ে যায়, কিন্তু শিশু যখন ক্রন্দন করে তখন আবার দুধ নেমে আসে। অতএব যেভাবে শিশুর ক্রন্দন ছাড়া মাতৃবক্ষে দুধ আসতে পারে না অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও তাঁর রহমতকে বান্দার ক্রন্দন এবং আহাজারির সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। বান্দা যখন আহাজারি করে তখন রহমতের দুগ্ধ অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়। অতএব আমি যেমনটি বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু মোনাফিকরা চেষ্টার যে অর্থ করে থাকে সেই চেষ্টা নয়। আর এরপর যত বেশি দোয়া করা যায়, আমাদের করা উচিত অর্থাৎ দোয়াকে সর্বোচ্চ মার্গে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সেই সময়ও তাহরীক করেছিলেন যে, ৭টি রোযা রাখুন আর দোয়া করুন। কয়েক বছর পূর্বে আমিও বলেছিলাম যে, জামা'তের রোযা রাখা উচিত। *(খুতবাতে মসরূর, খণ্ড: ৯, পৃ: ৫০১-৫০২)*

জামা'তে এখনও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং রোযা রাখে। এখন আমাদের সপ্তাহে একটি করে হলেও অন্ততপক্ষে ৪০টি রোযা রাখা

উচিত। অর্থাৎ ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত বিশেষভাবে রোযা রাখুন, দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন, কেননা কোন কোন জায়গায় জামা'ত কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। আমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে আহাজারি করব তখন যেভাবে শিশুর ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আকাশ থেকে আমাদের প্রভুর সাহায্যও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা নাযিল হবে আর সেসব প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা, যা আমাদের পথে বিদ্যমান, তা দূর হবে। পূর্বেও দূরীভূত হয়েছে আর এখনও ইনশাআল্লাহ্ তা'লা তা দূরীভূত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কিছু সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূর করা আমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে। শত্রুর মুখ আমরা বন্ধ করতে পারি না। তাদের কলমকে আমরা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না। তাদের মুখ এবং কলম থেকে এমন কিছু বের হয় যা শোনা এবং পড়ার শক্তি আমাদের নেই। (আর আজকাল আমরা দেখি, পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে চরম নোংরা ভাষা ব্যবহার করে বিজ্ঞাপনও লাগানো হয়। তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো, ইংরেজদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তখনও কথায় কর্ণপাত করা হতো না। তারা সেভাবেই শুনতো যেভাবে এক বধির শুনে।) হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সে যুগে মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে যেসব কথা বলা হতো সেসব কথাই অন্য কারো সম্পর্কে বলা হলে দেশে আগুন লেগে যেতো। কিন্তু সেসব কথা অবিরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয় কিন্তু যারা এমন কথা বলে তাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না। অথচ আমরা এই রিপোর্টও পেয়েছি যে, (এটি সেই যুগের কথা) কোন কোন বিরোধী পরিমণ্ডলে এ কথাও বলা হয় যে, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, আহমদীদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে লেখ, তোমাদের কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। *(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড: ১৭, পৃ: ১৫২-১৫৩)*

জামা'তের সাথে সব সময় এমন ব্যবহারই হয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সকল প্রতিবন্ধকতার মুখে জামা'ত উন্নতি-অগ্রগতি অব্যহত ছিল। এটি সেই সময়ের সরকারের অবস্থা ছিল যেই সরকার জামা'তের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করে নি। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে আর সেই আইন বিরোধীদের সাহায্যও করে থাকে আর তারা যা ইচ্ছে তা-ই করে। মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে মুখে যা আসে, যে অপলাপ করতে চায় এবং বাজে কথা বলতে চায় তারা বলে। আহমদীদেরকে অত্যাচার এবং নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয়। আদালতও এখন তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে আহমদীদের শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। অতএব এর জন্য খোদার দরবারে আমাদের অনেক বেশি আহাজারি করা প্রয়োজন। বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। বিশুদ্ধচিত্তে বা একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুঁকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে উদ্বেলিত করা ছাড়া আমাদের আর কোন গত্যন্তর নেই। আল্লাহ্ তা'লা বিশেষত সেসব আহমদীকে, যেখানে এই নির্যাতন এবং অত্যাচার হচ্ছে, যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানে হচ্ছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আর্‌শকে প্রকম্পিত করবে। আর সামগ্রিকভাবে সারা পৃথিবীর আহমদীদেরও জামা'তের উন্নতি এবং যুলুম ও নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও এই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(সূত্র: আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৪-১০ মার্চ ২০১৬, খণ্ড: ২৩, সংখ্যা: ১০, পৃ. ৫-৯)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা **"পাক্ষিক আহমদী"** পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক চাঁদা বাকী আছে। তাই অনুগ্রহ পূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহমদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরীয়ান, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

মোবাইল নং- ০১৭৩৬১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক চাঁদা ০১৯১২৭২৪৭৬৯ বিকাশ করতে পারেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

আহমদী মুসলিম গবেষকগণ ও ইসলামের স্বর্ণ যুগের পুনরুদ্ধার

আহমদীয়া মুসলিম রিসার্চ এসোসিয়েশন (AMRA)-এর সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ

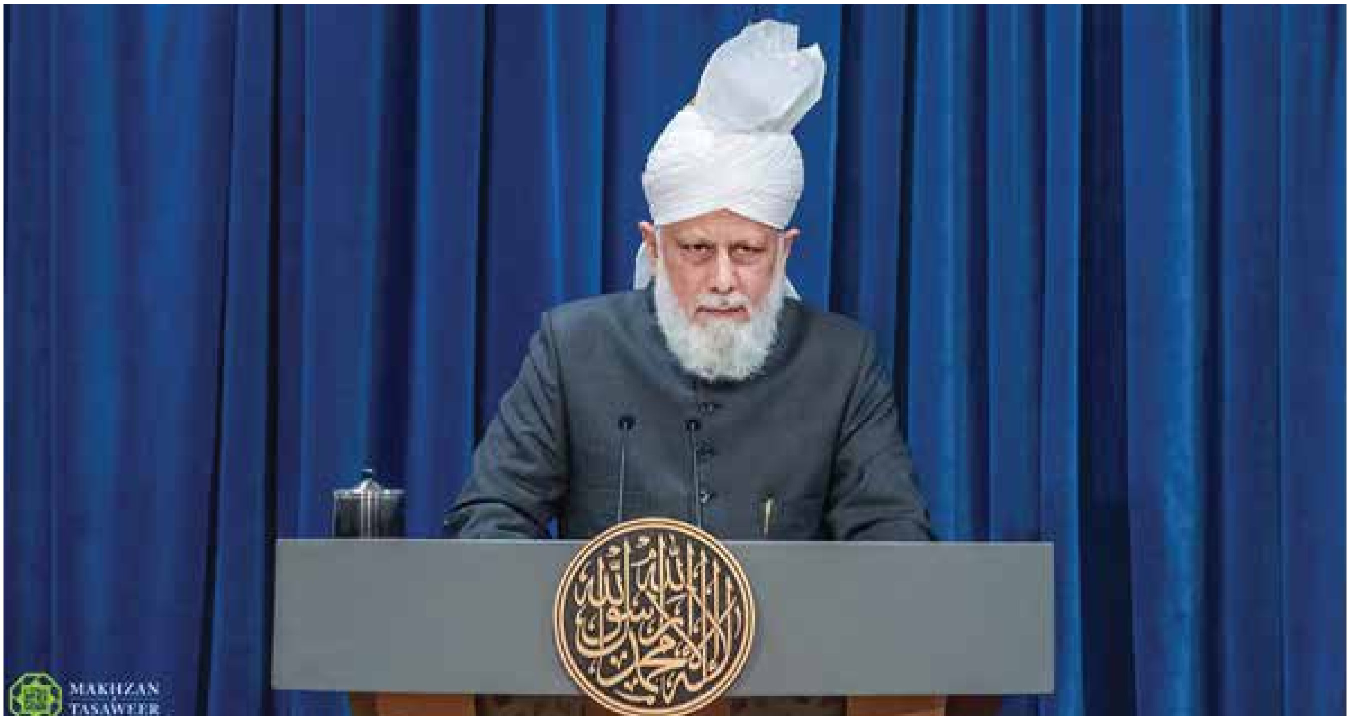

ইসলামের স্বর্ণ যুগে বিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র ও উদ্ভাবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মুসলিম গবেষকগণ উপনীত হয়েছিলেন। যখন ইউরোপ অন্ধকার যুগের তমসায় আচ্ছন্ন ছিল, মুসলিমগণ বিশ্বের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। আজ বিশ্বে ব্যবহৃত অনেক আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জন্য ইসলামের স্বর্ণ যুগের জ্ঞানগণ আলোকজ্জ্বলতা কৃতিত্বের দাবিদার। ইসলামের এ স্বর্ণ যুগ কি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব? ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম রিসার্চ এসোসিয়েশন (AMRA)-এর প্রথম সম্মেলন ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, যুক্তরাজ্যের মসরূর হলে অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ৬০ জন গবেষকসহ ২৫০ এর অধিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ৯টি দেশের প্রতিনিধিগণ এতে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটির সমাপনী অধিবেশনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বক্তব্য রাখেন। হুযূর আকদাসের ভাষণের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল।

তাশাহুদ, তাআব্বুয ও তাসমীয়ার পর হুযূর আকদাস পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন:

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿۱۹۱﴾

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۲﴾

এরপর হুযূর আকদাস বলেন: পবিত্র কুরআনের যে আয়াতগুলো আমি পাঠ করেছি সেগুলো সূরা আলে ইমরানের ১৯১-১৯২ আয়াত আর এর অনুবাদ:

নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং নিজেদের পার্শ্বদেশে (শুয়ে) আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃজনের বিষয়ে চিন্তা করে (এবং বলে) 'হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করো নি। তুমি পবিত্র, অতএব আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করো।

আজ, আল্লাহ্‌র ফযলে আপনারা আহমদীয়া মুসলিম রিসার্চ এসোসিয়েশনের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আমি দোয়া করি ও আশা করি যে, অনুষ্ঠানটি সকল অংশগ্রহণকারীর জন্য কল্যাণকর ও শিক্ষণের উৎস সাব্যস্ত হয়েছে।

পঠিত আয়াতসহ পবিত্র কুর'আনের অনেক আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন এবং আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে মনোনিবেশ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে আমাদের মস্তিষ্ক ব্যবহার করে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে এবং গবেষণা ও চিন্তার মাধ্যমে মানবীয় উন্নতি ও উদ্ভাবনার নতুন রাস্তাসমূহ সন্ধানের জন্য উৎসাহিত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে 'সৃষ্টির সেরা' এজন্যই আখ্যা দিয়েছেন যে আমাদেরকে চিন্তা ও বোধ শক্তি দান করা হয়েছে। আমাদেরকে ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। আমাদেরকে চিন্তা ও অনুধাবনের ক্ষমতা দান করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অনন্যভাবে, আল্লাহ্ তা'লা মানব জাতিকে এই অন্তর্দৃষ্টি দান করেছেন যেন আমরা অনুধাবন করতে পারি যে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা আমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন, এই শর্তে যে আমরা যেন একে সঠিকভাবে ব্যবহার করি।

নিশ্চিতভাবে, মহাবিশ্ব এবং এর সূচনা সম্পর্কে বিস্তৃত অন্তর্দৃষ্টি প্রদানের এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও জ্ঞানের সাধনায় উৎসাহ প্রদানের বিষয়ে সকল ঐশী ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে পবিত্র কুরআন অনন্য।

মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, যখনই একজন বিশ্বাসী পড়াশোনা করেন এবং পুরো বিশ্বের বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন এটি তার মনকে উন্মোচিত করে এবং একে আলোকিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। এর ফল এই হয় যে, তারা খোদা তা'লার অস্তিত্বের ওপর দৃঢ় ঈমানের দিকে অগ্রসর হয়, কেননা তারা চারিদিকে তাঁর অস্তিত্বের নিদর্শন ও প্রমাণাদি দেখতে পান।

অপরপক্ষে দুনিয়াদার ও ধর্ম-নিরপেক্ষ গবেষকদের আগ্রহ সীমিত এবং স্বল্প

পরিসর। যখন তারা কোনো কিছু নিয়ে গবেষণা করে, তারা সীমিত পরিসরে সেটি মূল্যায়ন করে।

একজন ধর্মভীরু ব্যক্তি কেবলমাত্র বিশ্বজগতের মাত্রাসমূহ ও এর বস্তুগণ গঠন চিহ্নিত করেই বা গ্রহসমূহের ও অন্যান্য বস্তুর অভিকর্ষজ আকর্ষণ বলের মান গণনা করেই সন্তুষ্ট হন না। আর না তারা কেবলমাত্র সূর্য, চন্দ্র বা তারকারাজির প্রধান বৈশিষ্টসমূহ নির্ণয় করে সন্তুষ্ট হন। বরং একজন প্রকৃত মুমিন আমাদের চারিদিকে অবস্থিত প্রকৃতি ও বিশ্বজগতের নিশ্ছিদ্র শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করার জন্য সদা সর্বদা চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করতে থাকেন। এই বাহ্যিক পৃথিবীর লুক্কায়িত বৈশিষ্ট্য বা সম্ভাবনাসমূহ চিহ্নিত করার জন্য তার মাঝে এক অপূরণীয় তৃষ্ণা থাকে এবং যতই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং ত্রুটিহীনতা তারা অনুধাবন করেন ততই তারা অবধারিতভাবে তাদের স্রষ্টার প্রতি ঈমানের দিকে আকৃষ্ট হন এবং খোদা তা'লার অস্তিত্বের উপর তাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।

ফলস্বরূপ, যখন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি আকাশ ও পৃথিবীর বা মহাবিশ্বের বা রাত ও দিনের দৈর্ঘ্য কেন সর্বদা কম-বেশি হতে থাকে তার ওপর মনোযোগ সহকারে চিন্তা করেন, তখন এটি খোদা তা'লাকে চেনার এবং তার নিশ্ছিদ্র সৃষ্টিকে অনুধাবন করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন তারা খোদা তা'লাকে এভাবে দেখেন এবং তার গরিমার সাথে পরিচিত হন, তখন তারা তাঁর দিকে অধিকতর আকুলতা ও আগ্রহের সাথে ঝুঁকেন এবং বিশ্বজগতের রহস্যসমূহ আরও গভীরভাবে অনুধাবন এবং আবিষ্কারের লক্ষ্যে তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহ যাচনা করেন।

তাঁর অনুগ্রহ এবং সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে একটু আগেই পঠিত পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলোতে খোদাভীরুদের বিশ্বাসের অবস্থা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তারা (বিশ্বাসী মুসলিমগণ) দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় তাঁকে স্মরণ করেন। যখন তারা আল্লাহ্ তা'লার কাছে পথনির্দেশনার জন্য দোয়া করেন তখন তিনি তাদের চিন্তাকে পরিশুদ্ধ করেন। তাদের মনকে আলোকিত করেন এবং পূর্বে বিদ্যমান অস্পষ্টতার ধূম্রজাল অপসারিত করেন। তিনি বিশ্বজগত এবং গ্রহ-নক্ষত্ররাজি সম্পর্কে এক অনুধাবন তাদেরকে দান করেন এবং তারা নিশ্চিতভাবে এটি শনাক্ত করেন যে এমন নিশ্ছিদ্র ও সূক্ষ্ম নিয়মতান্ত্রিকতা কখনো কেবলমাত্র দৈবক্রমে বা আপনা-আপনি সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। বরং এটি এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রতিফলন এবং নির্দেশক। নিশ্চিতভাবে, একজন সার্বজনীন স্রষ্টার অস্তিত্বের এটি একটি প্রমাণ।

ঐ সকল মানুষ, যাদের হৃদয়সমূহ এভাবে উন্মোচিত হয়, তারা তাদের স্রষ্টার সামনে ঝুঁকেন এবং তাঁর কাছে দোয়া করেন যেন তারা তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা পান এবং সমৃদ্ধি অর্জনের ও তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে গভীরতর উপলব্ধি লাভের দিকে তাদের পথ প্রদর্শন করেন।

অনুরূপভাবে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন যে পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা এবং অন্যান্য বিজ্ঞানের ক্রমাগত সাধনা একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সব সময় খোদা তা'লার দিকেই ধাবিত করবে। খোদার সৃষ্টি এবং তাদের পারিপার্শ্বিক বিশ্ব সম্পর্কে তারা যতই জ্ঞান লাভ করবেন, ততই এ বিশ্ব জগতের বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সৌন্দর্যকে বেশি বেশি অনুধাবন করবেন। একবার একজন মুমিন যখন এমন জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন, তখন তিনি কেবল অন্যান্যদেরকে সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি

সম্পর্কে অবহিত করার যোগ্যতা লাভ করেন না, বরং বিশ্বের সামনে সকল সৃষ্টির স্রষ্টা এক খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ বিশ্বের সামনে উপস্থাপনের সক্ষমতাও তিনি লাভ করেন।

এটিই একজন প্রকৃত মুমিনের চিহ্ন, তার সফলতার মাধ্যম এবং বিশ্বে তার প্রকৃত মর্যাদা ও সম্মান লাভের পথ। এভাবে বিশ্ব জগতের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার মাধ্যমে প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম সাহেব তাঁর পুরো জীবন তিনি যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন তা খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণরূপে উপস্থাপনে ব্যবহার করে গেছেন।

তাই সকল আহমদী গবেষক ও শিক্ষাবিদের নিজেদের কোন গবেষণা বা অনুসন্ধানের সময় এবং এর পরে খোদা তা'লার একত্বের বিষয়টি সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিতে রাখা উচিত। তাদের অনুসন্ধানসমূহ এই দৃঢ় সংকল্পের সাথে তাদের পরিচালনা করা উচিত যেন এর মাধ্যমে এমন প্রমাণসমূহ সংগৃহীত হয় যা তাদেরকে সন্দেহ পোষণকারী ও অবিশ্বাসীদের নিকট এক খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ করার সক্ষমতা দান করবে এবং ঐ সকল ব্যক্তির অভিমতকে রদ করার যোগ্যতা দান করবে যারা দাবি করে যে বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর সাংঘর্ষিক।

যখন তারা এভাবে গবেষণা করবেন এবং প্রতি পদক্ষেপে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লার সহায়তা যাচনা করবেন, নিশ্চিতভাবে তিনি প্রতিটি মোড়ে তাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তাদের পথপ্রদর্শনকারী আলোকবর্তিকা হয়ে যাবেন।

যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, একজন ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তির গবেষণা একেবারেই জাগতিক আঙ্গিক থেকে হয়ে থাকে আর তারা তাদের মেধাকে জাগতিক উন্নতির জন্য ব্যবহার করে থাকেন। তাদের প্রয়াসের ফলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হতে পারে, কিন্তু একজন বিশ্বাসীর গবেষণার প্রভাব এর চাইতেও অনেক বৃহত্তর হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। তাদের গবেষণার ফলসমূহ কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আধুনিক প্রযুক্তির উদ্ভাবনেই নয়, বরং এর পাশাপাশি খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ প্রদানেও ভূমিকা রাখবে।

সুতরাং, আহমদী মুসলিম গবেষকগণের, বিশেষ করে তারা যারা বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে গবেষণা করছেন, কেবল তাদের পছন্দের বিষয় বা ক্ষেত্রটির জ্ঞানগত অগ্রগতি সাধন করা তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়, বরং এর পাশাপাশি খোদা তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ অনুসন্ধানে তাঁদের এক চিরন্তন প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা উচিত।

যেভাবে আমি বলেছি, এভাবেই ড. আব্দুস সালাম সাহেব তাঁর গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেছেন এবং এর ফলস্বরূপ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন।

স্মরণ রাখবেন যে মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার অধিকারী ঐ সকল ব্যক্তি যারা কখনো খোদা তা'লাকে ভুলে যান না এবং সর্বদা তাঁকে স্মরণ রাখেন। *চলবে...*

কবিতা

প্রভাকর

মেহেদী হাসান মুসা

হিম কোলে তুমি জন্মিছ জানি ওহে,
বুকে তব বারি ধারা।
দাঁড়া আছ মাঝে বহু কাটা সম ব্রোহে,
তবু থির তুমি, খাড়া।

জন্ম দাও হে কত যে শত নূর জানি,
অমানিশা কর দূর।
বৈভব হে তব আছে যে শত তা মানি,
পুণ্যে জাগাও সুর।

খ্যাতি তব ওহে,
মুখে জ্বলে জ্যোতি সম,
অন্ধ কি আর দ্যাখে?
আছে যার চোখ,
সে যে দ্যাখে অনুপম,
কত অবদান রাখে!

কত মধু কথা কত সুর বাজে হেথা,
জানো কি হে, তুমি?
পুণ্য পাবার কত আছে সে সু-কেতা,
থেকো না আর ঘুমি।

তোল তোল তাল,
ধর তবে হাল তার,
গুটিয়া তোমার সুখ।
সারিতে সারিতে চল হব পার,
ফেরাব না আর মুখ।

***

আফ্রিকার প্রকৃত স্বাধীনতা

আফ্রিকার কয়েকটি দেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরপূর্তি অনুষ্ঠান 'আফ্রিকা এ্যাট ফিফটি'-তে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধানের মূল ভাষণ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্যান আফ্রিকান সমিতি ২৩নভেম্বর ২০১০ আলজেরিয়া, বুরুন্ডি, মালাউই, রুয়ান্ডা ও উগান্ডার স্বাধীনতার ৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে মূল বক্তব্য প্রদান করেন নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রধান ও পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)। আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও অতিথি দক্ষিণ-পশ্চিমলন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এর আগে সম্মানিত হুযূর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাতকার প্রদান করেন।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন উগান্ডার হাই কমিশনার হার এক্সিলেন্সি প্রফেসর জয়েস কাকুরামাৎসি এবং ঘানার বিরোধ দলীয় নেতা অনারেবল নানা আকুফো-আডো।

তাশাহুদ ও তাআব্বুয পাঠের পর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, বার বার দয়াকারী।

সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ -- আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সবার ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

প্রথমে আমি প্যান আফ্রিকান এ্যাসোসিয়েশনকে ধন্যবাদ জানাই আজকের এ অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আজকের এ বিকেলে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং অ-আহমদীকে বন্ধুদের আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য ধন্যবাদ জানাই। আহমদীয়া সম্প্রদায়ের প্যান-আফ্রিকান সমিতি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ ও মূল্যবান কেননা আফ্রিকার কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের জন্য এটি করা হচ্ছে। এ দেশগুলো হল আলজেরিয়া, মালাউই, রুয়ান্ডা, উগান্ডা এবং বুরুন্ডি। এদের স্বাধীনতা উদ্‌যাপন এসব দেশের সাথে আমাদের একাত্মতা ও বন্ধুত্বেরই এক অভিব্যক্তি।

এ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে, ইসলাম প্রত্যেক দেশ ও জাতির স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। ইসলাম এ শিক্ষা দেয় যে, কাউকে বশ্যতা এবং অত্যাচার থেকে মুক্ত করা এমন একটি মহান ধার্মিক আচরণ যার ফলস্বরূপ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে বিশাল পুরস্কার লাভ করা যায়। পবিত্র কুরআনের ৯০তম সূরায় আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অন্যদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করা, ক্ষুধার্তদের চাহিদা পূরণ, বিপদ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করা ও এতিমদের লালন-পালনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এটি এ কারণেই বলা হয়েছে যে, এ ধরনের কাজ এক দিকে যেমন সমাজে ভালবাসা ও মমতৃবোধের পরিবেশ সৃষ্টি করবে, অন্য দিকে এটি আধ্যাত্মিক উন্নতি ও খোদা তা'লার নৈকট্য লাভেরও কারণ হবে। সুতরাং প্রকৃত মুসলমান ও মুসলিম সরকারসমূহের সব সময়ই স্বাধীনতাকে উৎসাহ দেয়া উচিত এবং অপরকে স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা উচিত, সে স্বাধীনতা ব্যক্তি সত্তার বা জাতীয়– যাই হোক না কেন।

আহমদীয়া জামা'ত যুগ ইমাম কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে গ্রহণ করেছে, যাকে আল্লাহ্ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য পাঠিয়েছেন। আর তাই, এ প্রকৃত শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে আমরা সার্বজনীন স্বাধীনতা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর কর্ম-প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকি, এ আকাঙ্ক্ষার সাথে যে বিশ্বের প্রতিটি মানুষ স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারবে। সকল মানুষের মৌলিক স্বাধীনতাসমূহ যেমন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, জাতীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা থাকা উচিত। আমরা আহমদীগণ, বিশেষতঃ সকল মানুষকে এ সকল স্বাধীনতা প্রদানের বিষয়ে সরকারসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াসী হই এবং যেখানেই এ প্রয়াসে আমাদের কার্যক্ষেত্রে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার সুযোগ থাকে, সেখানে আমরা সবসময়ই তা করে থাকি।

নিশ্চিতভাবে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার জন্য এবং ফিলিস্তিনের জনগণের স্বাধীনতার জন্য আমরা আমাদের ভূমিকা পালন করেছি এবং কাজ করেছি। অনুরূপভাবে যেখানেই

আমরা সুযোগ পেয়েছি, আমাদের সকল সদস্য যারা প্রভাব রাখেন, যার মধ্যে মরহুম স্যার চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান (রা.)-এর অবস্থান সর্বাগ্রে, অন্যান্যদের স্বাধীনতা অর্জনে মহান উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন এবং নিজ ভূমিকা পালন করেন। নিশ্চয় এর কারণ সেই প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা যার প্রচার আহমদীয়া জামা'ত সর্বদা করে এসেছে এবং আজও করে চলেছে।

আপনারা হয়তো এ কথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হবেন যে আজ আহমদীগণ অন্যান্যদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করছে, এমন এক সময়ে যখন প্রায় সকল দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং বাহ্যতঃ তারা স্বাধীন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, যেখানে ভাসা-ভাসা দৃষ্টিতে দেখলে দেশগুলোর এক বড় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্বাধীন এবং তারা নিজেদের জনগণের মধ্য হতেই সরকার গঠন করেছে, কিন্তু বাস্তবতা এই যে, অনেক উন্নয়নশীল দেশ অথবা ঐ সকল দেশ যেগুলোকে কখনো তৃতীয় বিশ্বের দেশ বলে অভিহিত করা হয়, তারা এখনো বিশ্বের পরাশক্তিগুলো দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং তাদের চাপের শিকার। শক্তিশালী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোর সুযোগ নিয়ে থাকে এবং তাদের নিজ পছন্দনীয় নীতিসমূহ তাদের ওপর আরোপ করে থাকে, আর তাই এভাবে তারা কার্যতঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিজেদের দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রেখেছে। দুঃখজনক বিষয় এই যে, বৃহৎ শক্তিগুলোর দরিদ্র দেশগুলোর প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হয় এবং সুযোগ নেয় কিন্তু এর বিনিময়ে দুর্বল দেশগুলোকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করে না। এভাবে উন্নয়নশীল দেশ এবং তাদের জনগণের প্রকাশ্য শোষণ চলমান।

তদুপরি, কখনো কখনো নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা একই দেশের এবং একই জাতির মধ্য থেকে হওয়া সত্ত্বেও, তাদের জনগণের অধিকার রক্ষা করে না। এর ফলে জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলস্বরূপ, সময়ে সময়ে আমরা দেখি যে কোন কোন দেশে জনগণ প্রতিবাদে তাদের নিজ নেতাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। পরিণামে এই প্রতিবাদসমূহ শাসকদের অবিচারের ফলস্বরূপ সৃষ্ট নৈরাশ্যের কারণে সরাসরি চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এমন গণ অসন্তোষ কেবল আরব বিশ্বেই দেখা যায় না, বরং আমরা অতি সাম্প্রতিককালে দেখেছি যে, কতক আফ্রিকান দেশ এমন প্রচণ্ড দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার শিকার। তাই আজও কয়েকটি দেশে জনগণ উত্তাল ও অস্থির। এটিও এক ধরনের দাসতত্ব যা থেকে মানুষকে মুক্ত করতে হবে– যেন শান্তি প্রসার লাভ করতে পারে এবং যেন পৃথিবীতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্মরণ রাখবেন, আজকের পৃথিবীতে সাফল্য এবং উন্নতি তখনই আসতে পারে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আর দৃষ্টিভঙ্গি বা নীতির সংঘাত কোন জাতির উন্নতির পথে বাঁধ না সাধে। উন্নত দেশগুলোতেও আমরা সব সময় বিভিন্ন দলের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করে থাকি। প্রত্যেক দলের নিজস্ব নীতি রয়েছে এবং তারা সেটিকেই সর্বোত্তম বলে মনে করে। কিন্তু, তারা কখনো এ মতবিরোধকে দেশের অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি আমরা যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকাই, অতি সম্প্রতি, বিশাল অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছিল এ কারণে যে বিরোধী দলের সরকার পক্ষের সাথে বড় রকমের মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর তারা নিজ দেশের খাতিরে একতাবদ্ধ হয়েছে এবং সংকট নিরসনে সমর্থ হয়েছে আর একটি সমঝোতায় উপনীত হতে সক্ষম হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে আমরা এমন প্রতিবাদ বা সমাবেশ দেখি না যেখানে রাষ্ট্রীয় ভবনসমূহ ভাঙচুর করা হয় বা দেশের ক্ষতি করা হয়।

আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত নিজ দেশের সম্পদ ভাঙচুর করা এবং উগ্রবাদী প্রতিবাদ সমাবেশ আয়োজন করাতে অন্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং কেবল আপনাদের নিজেদেরই এবং নিজেদের দেশের ক্ষতি হয়। যদি কেউ মনে করেন যে, চরমপন্থী পদক্ষেপ গ্রহণ করাই তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার একমাত্র পদ্ধতি, তবে তারা সম্পূর্ণ ভুল। এমন দৃষ্টিভঙ্গি কেবল ক্ষতির কারণ হবে এবং এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জন সত্ত্বেও তাদের দেশ ও এর জনগণ কখনো সফলতা বা উন্নতি লাভ করবে না। আমাদের সবসময় নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের মত পার্থক্য, আমাদের ব্যক্তিগত অহমিকা এবং দলীয় স্বার্থকে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য যেন ত্যাগ করা হয়, বরং আমাদের সবসময় জাতীয় উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেয়া উচিত। আমরা যখন এভাবে আমাদের চিন্তা ও আচরণকে সাজাবো তখন আমাদের ভিন্নমত আমাদের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে না, বরং প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।

যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই -- এটি এমন এক দেশ যার কাছে তার প্রয়োজনীয় সবকিছুই আছে। এর প্রাকৃতিক সম্পদ আছে, এর বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু আছে যার ফলে, কৃষির দিক থেকে, প্রায় সকল ধরনের ফসলই সেখানে উৎপাদন করা যায়। জমি উর্বর আর আল্লাহ্ তা'লা পানি সরবরাহের উৎস তাদেরকে দান করেছেন। এসব কিছু সত্ত্বেও যে সংঘাত, বিভেদ ও সন্ত্রাস দেশটিকে আক্রান্ত করেছে এবং শিকড় গেড়ে বসেছে তার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ দেশটির উন্নয়ন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েগেছে।

অনুরূপভাবে যদি আমরা নাইজেরিয়ার দিকে তাকাই– যদিও এর রয়েছে অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে বিশাল খনিজ তেলের সম্ভার -- তবু দেশটি উন্নতি করছে না বরং পশ্চাৎ গতিতে ধাবমান। এর কারণ এই যে আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিভেদ নিজের স্থান করে নিয়েছে এবং সার্বিক রাষ্ট্রীয় কল্যাণের ওপর স্বার্থান্বেষী মহল নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আজ আমাদেরকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, পৃথিবী এক বৈশ্বিক পল্লীতে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসী সংগঠন এবং গোষ্ঠী যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে তারা কেবল এশিয়ার দেশগুলোতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখন আফ্রিকাতেও প্রবেশ করেছে। মনে করা হতো

যে, সন্ত্রাসীরা হয়তো আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হবে না, কিন্তু এখন আমরা দেখি যে নাইজেরিয়া এবং আরো কতক দেশে এমন গোষ্ঠীসমূহ তাদের বিদ্বেষের নেটওয়ার্ক বিস্তার করে চলেছে। তারা সম্পদের ক্ষতি করছে আর আত্মঘাতী বোমা হামলা পরিচালনা করছে এবং আরো বিভিন্ন ধরনের হামলা, যার সবগুলোই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

তাই, সকল দেশের সদা সতর্ক থাকা উচিত, কেননা এ ঝুঁকি রয়েছে যে এমন চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলো ঐসব দেশেও তাদের জাল বিস্তার করবে, যেগুলো এ পর্যন্ত তাদের বিদ্বেষমূলক প্রভাব থেকে রক্ষা পেয়েছে। নতুবা, এটি অসম্ভব নয় যে, প্রত্যেক দেশ শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থিতার শিকার হবে। যেভাবে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, যেখানেই চরমপন্থী এবং সন্ত্রাসীরা নিজেদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে, এর ফল এই হয়েছে যে, সেই দেশের উন্নতি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে এবং দেশটির রাজনৈতিক জাতীয় ক্ষমতা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর তাই যদি সকল দেশ এমন হুমকির বিষয়ে তাৎক্ষণিক দৃষ্টি না দেয় তবে তাদেরও অনুরূপ পরিণতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, যার ফলে তাদের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। নিশ্চিতভাবে, যেখানে একটি দেশের শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এর ফলস্বরূপ বৃহৎ শক্তিগুলো সেই সকল দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবে এবং পুনরায় ঐ সকল নাজুক উন্নয়নশীল দেশকে পুনরায় তাদের দাসত্বের শৃংখলে বন্দী করতে সচেষ্ট হবে।

তাই আপনাদের স্বাধীনতাকে বজায় রাখতে হলে এবং নিজেদেরকে সকল প্রকার দাসত্ব হতে মুক্ত রাখতে হলে, এটি আবশ্যক যে আপনারা যেন আপনাদের মতবিরোধকে আপনাদের দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর সুযোগ না দেন। বরং এটি আবশ্যক যে আপনারা আপনাদের অভিমত ও নীতির বৈচিত্র্যকে আপনাদের দেশকে সবচেয়ে শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাজে লাগান। সরকারের উচিত ভালোবাসা, যত্ন ও ন্যায়বিচারের সাথে তাদের জনগণের খেয়াল রাখা। বিনিময়ে, জনগণের উচিত তাদের দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করা। জনগণের উচিত আইনের সীমার মধ্যে থাকা এবং ঐ সকল লোক যারা দেশের ক্ষতি করতে চায় অবচেতন ভাবে তাদের সহযোগিতার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ উপায়েতাদের সমস্যাসমূহের সমাধানের চেষ্টা করা। যদি এই বিশ্বাসকে গড়ে তোলা যায় যে, অন্য সকল স্বার্থের উর্ধ্বে দেশের প্রতি বিশ্বস্ততা আর দেশের সফলতাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, তবে সফলতার সুবাতাস বইতে থাকবে। এমন দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের স্বাধীনতাকে স্থায়ী করবে এবং বহুমুখী ভবিষ্যৎ সফলতা ও অগ্রগতির দ্বারসমূহ খুলে দিবে।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আফ্রিকার সামর্থ্য রয়েছে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়ার এবং পথ প্রদর্শনের। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে আপনাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে এবং একতাবদ্ধ থাকতে হবে, যেন দাসত্বের কাছে মাথা নত করার পরিবর্তে আপনারা সেই জাতিতে পরিণত হন যারা বিশ্বের সামনের কাতারে দণ্ডায়মান হয়। সর্বদা স্মরণ রাখবেন আপনাদের স্বাধীনতার বার্ষিকী উদযাপন করা বা জুবিলী পালন করা কেবল তখনই কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে যদি আপনারা সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রেরণা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হন। এটি কেবল তখনই কল্যাণকর হবে যদি আপনারা আপনাদের স্বাধীনতার সুযোগ নেয়ার বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হোন এবং নিজ জাতিকে সফলতার পথে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার আকাঙ্ক্ষা রাখেন যেন তা ঐ সকল দেশের পর্যায়ে শামিল হতে পারে যেগুলো কে পূর্ণাঙ্গভাবে উন্নত ও সফল বলে গণ্য করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা সকল আফ্রিকান দেশকে প্রাকৃতিক সম্পদ দান করেছেন এবং তিনি এর জনগণকে মেধাবী ও উর্বর মস্তিষ্ক দান করেছেন। সুতরাং আপনারা খোদা তা'লার এই উপহারসমূহ থেকে কল্যাণ এবং অগ্রগতি নতুন রাস্তাসমূহ আবিষ্কার করুন।

আমার দোয়া এই যে আল্লাহ্ তা'লা সকল আফ্রিকান দেশকে, তাদের জনগণকে এবং তাদের সরকারগুলোকে একত্রে শান্তি, সৌহার্দ্য ও একতার সাথে বসবাস করার প্রকৃত কল্যাণসমূহ অনুধাবনের তৌফিক দান করুন। আমার দোয়া এই যে তারা যেন সকলেই অনুভব করে যে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থের ওপর তাদের জাতীয়স্বার্থকে অগ্রাধিকার প্রদান করার মধ্যেই সেই সোনালী চাবি রয়েছে যা স্থায়ী স্বাধীনতা ও সাফল্যের দুয়ার খুলে দিবে। আল্লাহ্ করুন, এমনই যেন হয়।

আফ্রিকা দীর্ঘজীবী হোক!

আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

অনুবাদ:

প্রফেসর তারিক সাইফুল ইসলাম

খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি

মওলানা শাহ্‌ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۶﴾

অনুবাদ: তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের মাঝে খলীফা বানিয়েছেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপর যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী। *(সূরা নূর - ৫৬)*

‘খেলাফতে আহমদীয়ার’ অফুরন্ত কল্যাণরাজির এক ঝলক

খেলাফতে আহমদীয়া চির প্রবাহমান এক কল্যাণধারার নাম। অবারিত ধারায় প্রবাহিত স্রোতস্রীনির নাম। যাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে, যাঁর পবিত্র ছায়াতলে ১১০ বছর কাটিয়ে আমরা লাভ করেছি অনেক বিরল প্রাপ্তি। যা আমরা কখনও গুণে শেষ করতে পারবো না। নিচে এর এক কিঞ্চিৎ ঝলকমাত্র অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করছি।

১. খেলাফতের নেতৃত্বে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ভিত ২১০ টি দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২. আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের পতাকা তলে ২০ কোটি মানুষ একত্রিত হয়েছে।

৩. বিশ্বব্যাপি ৭৬ টি ভাষায় পবিত্র কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

৪. বিশ্বব্যাপি প্রায় ২০ হাজার মিশন হাউজ নির্মিত হয়েছে।

৫. বিশ্বব্যাপি প্রায় ১৮ হাজার মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

৬. প্রতি বছর কোটি কোটি বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইসলাম প্রচারের জন্য প্রকাশ ও বিতরণ হচ্ছে।

৭. ১৫ টি জামেয়া প্রতিষ্ঠা, যা থেকে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য শত শত মুবাল্লেগ তৈরী হচ্ছে।

৮. ওয়াকফে-জাদীদ ও তাহরীকে-জাদীদ প্রতিষ্ঠা করে আহমদীয়াতকে বিশ্বব্যাপী সম্প্রসার ও সমৃদ্ধকরণ।

৯. ওয়াকফে নও স্কিম প্রতিষ্ঠাতা যার অধিনে এ শতাব্দীতে লক্ষ লক্ষ ধর্মের নিবেদিত প্রাণ সেবক তৈরী হবে।

১০. বিশ্বব্যাপি (বিশেষ করে পাশচাত্যে) ইসলামকে শান্তির ধর্ম হিসেবে পরিচিত করা।

১১. বিশ্বব্যাপি শতাধিক অমুসলিম দেশে সর্ব প্রথম মসজিদ নিমানের্র সুযোগ লাভ করা।

১২. বিশ্বব্যাপি শত শত অমুসলিম অধ্যুষিত শহরে মসজিদ নির্মাণ করা।

১৩. বিশ্বব্যাপি ২৪ ঘন্টা ইসলামী অনুষ্ঠান সম্প্রচারকারী এক টিভি চ্যানেল এমটিএ উপহার দেয়া।

১৪. ইন্টারনেটকে ইসলাম প্রচারের কাজে সুচারুভাবে ব্যবহার করা।

১৫. হিউমিনিটি ফার্স্ট নামে আর্ন্তজাতিক এক মানবতার সেবাকারী প্রতিষ্ঠান উপহার দেয়া। যার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ সেবা পাচ্ছে।

১৬. নুসরাত জাহাঁ স্কিম উপহার দেয়া যার মাধ্যমে আফ্রিকার কোটি কোটি হত দরিদ্র মানুষ শিক্ষা, অন্ন, বস্ত্র, বিশুদ্ধ পানি, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিদ্যুতসহ অনেক সুবিধা পাচ্ছে।

১৭. বিশ্ববাসীকে শান্তিপ্রিয়, সুশৃংখল, সন্ত্রাসমুক্ত, মানবতাবাদী, ধার্মিক, সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারকারী ও খাটি এক ইসলামী সংগঠন উপহার দেয়া। যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের খাতিরে ইসলাম প্রচারের জন্য নিজেদের উপার্জনের ষোল ভাগে এক ভাগ থেকে নিয়ে তিন ভাগের একভাগ পর্যন্ত অবলিলায় সেচ্ছায় আমৃত্যু দান করে। এমনকি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও।

১৮. সর্বপুরি খলীফাও জগদ্বাসীর জন্য এমন এক ঐশী নেতা যিনি জগত থেকে শিরক ও বেদাত মিটানোর জন্য, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখার জন্য এক অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন।

খেলাফতে রাশেদা ইসলামী উন্নতির চাবিকাঠি

খেলাফত কী? খেলাফত ঐ হাবলুল্লাহ, ঐ রশি যা আমাদেরকে খোদা তা'লার সাথে সর্ম্পকযুক্ত রাখে। সব ধরনের দলাদলি, বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্ত রাখে। খেলাফত ঐ বৃক্ষ, ঐ ছাতা যার ছায়া আমাদের সব ধরনের অশান্তি, নৈরাজ্য, বিশৃংখলা থেকে নিরাপদ রাখে। খলীফা ঐ মহান পথ প্রদর্শক যিনি অত্যন্ত দ্রুত বেগে উন্নতির পথে, সফলতার পথে নিয়ে যান।

খলীফা একজন সাধারণ ব্যক্তি নন। নবী ও রাসূলে স্থলাভিষিক্ত হলেন খলীফা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন-

"মানুষ চিরস্থায়ী নয়। এ জন্য খোদা তা'লা ইচ্ছা করেছেন- রসূলের সত্তা যা জগতের অপরাপর সকল সত্তা থেকে শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত তা যেন কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে। সুতরাং এজন্য খোদা তা'লা খেলাফত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছেন। যেন কোন যুগ কখনও নবুওয়্যাতের বরকত থেকে বঞ্চিত না থাকে। নবীর অবর্তমানে নবীর প্রতিনিধিত্ব করেন খলীফা। এ কারণে নবীর প্রতিটি কাজে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা সাহায্য করেন, সফলতা দেন, ঠিক সেভাবেই খলীফাকেও করে থাকেন।"

ইসলামের ইতিহাস এর জ্বলন্ত প্রমাণ। খেলাফতে রাশেদা মাত্র ৩০ বছর ছিল। এর কল্যাণে এই অল্প সময়েই ইসলামের মাঝে অসাধারণ উন্নতি ও বিজয় সাধিত হয়েছিল। চার দিকের বিশৃংখলা, বিদ্রোহ দমন। মদিনা রাষ্ট্রের সুরক্ষা বিধান, কুরআন সংরক্ষন, মূল পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত, মূল পাণ্ডুলিপির অনুকরণে একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি, সেগুলোকে দূরদূরান্তের রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। নতুন নতুন জায়গায় মসজিদ নির্মান, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী সম্রাজ্যকে আরব উপদ্বীপের বাইরে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া, এসব কাজ ঐ যুগেই সম্পন্ন হয়েছিল।

মাত্র ৩০বছর আগে ফিরে গেলে দেখবেন তখন এ চিত্র ছিল না। তখন ভিন্ন এক চিত্র ছিল। মুসলমানরা তাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবী, প্রিয় নেতা মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তেকালের পর ছিল দিশেহারা, হতাশ। এমনকি তাদের অনেকে নিরাশ হয়ে মুরতাদও হয়ে গিয়েছিল। তারা ভেবে পাচ্ছিল না- এখন আমাদের কি হবে? অপরদিকে খারিজীদের উত্থান হয়, ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব হয়। তারা মুসলমানদের ওপর একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে। এক নাজুক অবস্থায় মুসলমানরা। চারদিকে বিশৃংখলা, বিদ্রোহ, হত্যাযজ্ঞ। মদিনা রাষ্ট্র হুমকির সম্মুখীন। সেই পরিস্থিতিতে শোকে কাতর মুসলমানরা খলীফা হিসেবে, নেতা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.)-কে পেল। তার হাতে বয়াত নিল। আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফা তাদের নেতা হলেন।

তখন উসামা বিন যায়েদের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। সবাই খলীফাকে পরামর্শ দিলেন- চারদিকে বিদ্রোহ, মদিনা অরক্ষিত। এ অবস্থায় এ অভিযান বন্ধ রেখে মদিনার হেফাযতের ব্যবস্থা নেয়া হোক। আবু বকর তেজো দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, শত্রুরা যদি মদিনা আক্রমণ করে তছনছ করে দেয়, জন্তু জানোয়ার যদি লাশ নিয়ে মদিনার অলি গলিতে টেনে হেচড়ে খেতে থাকে তারপরও আমি এ অভিযান বন্ধ করতে পারব না। বাহিনী যাবেই।

বলা হল, উসামা ছোট বাচ্চা। যুদ্ধ পরিচালনায় অভিজ্ঞ বড় বড় সাহাবীরা আছেন, তাদেরকে এ বাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করা হোক। যুদ্ধে জয়ের জন্য অভিজ্ঞতার খুবই প্রয়োজন। আবু বকর বললেন, আবু কুহাফার পুত্রের কি অধিকার আছে, কি সাধ্য আছে? যাকে আল্লাহ্‌র রসূল কমাণ্ডার নিযুক্ত করেছেন তাকে অপসারন করে। বাহিনী শেষে উসামারা নেতৃত্ব যায় এবং বিজয়ী ও সফল হয়ে ফিরে আসে।

শুধু তাই নয়, খলীফা হিসেবে আবু বকর (রা.)-কে পাওয়ার পর তাদের মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। সব বিশৃংখলা, বিদ্রোহ, থেমে যায়। মুসলমানরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়। শুধু ঘুরেই দাঁড়ায় নি বরং একটার পর একটা সফলতার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে, সমগ্র আরব উপদ্বীপ, মিশর, ইরাক ইরানসহ ইউরোপের এক বিস্তীর্ন এলাকা নিজেদের পদতলে নিয়ে আসে। অখ্যাত, অশিক্ষিত যাযাবর এক জাতি পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য সুসভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়ে যায়। এক বিশাল সম্রাজ্যের মালিক হয়ে যায়। জগতের পরাশক্তিতে পরিণত হয়। কেউ নেই তাদের সামনে দাঁড়ানোর, কেউ নেই তাদের মোকাবেলা করার। এক কথায় খেলাফতে রাশেদা ইসলামের উন্নতি ও বিজয়ের এক বিস্ময়কর চাবিকাঠি ছিল।

খলীফা বানানো খোদার কাজ

এই গৌরব মুসলমানরা বেশি দিন ধরে রাখতে পারে নি। খেলাফত রাশেদার বিলুপ্তি ঘটার পর মুসলমানরা প্রায় সাড়ে ১৩শত বছর যাবৎ খেলাফতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তবে এই হারানো গৌরব ও নেয়ামত ফিরে পাবার জন্য মুসলমানরা কম চেষ্টা করে নি। ইতিহাস সাক্ষ্য, এজন্য অনেক আন্দোলন হয়েছে, সাধারণ মানুষের সাথে মৌলভীরা, বড় বড় নেতারা এমনকি রাজা বাদশারাও যুক্ত হয়েছেন। কিন্তু তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। আর কখনও পারবেনও না।

কারণ খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয়। বরং আল্লাহ্‌র কাজ। আর আল্লাহ্‌র কাজ মানুষের পক্ষে করা সাধ্যাতিত। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.) বলেন, "আমি তোমাদেরকে বারবার বলেছি, আর পবিত্র কুরআনে প্রত্যক্ষ করেছি- إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً খলীফা বানানো মানুষের কাজ নয়, বরং এটা খোদা তালার কাজ। হযরত আদম (আ.)-কে খলীফা কে বানিয়েছেন? আল্লাহ্ তা'লা বলেন, নিশ্চয় আমিই পৃথিবীতে খলীফা বানাবো।" *(বদর ৪ জুলাই, ১৯১২)*

খলীফা বানানো আল্লাহ্ তা'লার কাজ। এজন্য আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলে গেছেন, **সুম্মা তাকুনু খিলাফাতুন আলা মিনহাজিন নবুওওয়াহ** অর্থাৎ আবার নবুওয়্যাতের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আজ থেকে ১২৯ বছর পূর্বে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী রূপে আগমন করেন। তিনি আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জামা'তকে জানিয়ে যান, "আমি খোদার পক্ষ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মূর্তিমান কুদরত। আমার পর আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় কুদরতের বিকাশ হবেন।" *(আল ওসিয়্যত, পৃ -১৬)*

তিনি (আ.) আরও বলেন, "কারণ তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্য শ্রেয়। কেননা এটা স্থায়ী, এর ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না।" *(আল ওসিয়্যত, পৃ -১৫)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই সুসংবাদ অনুযায়ী ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর জামা'তে আহমদীয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এটা ১১০ বছর যাবত সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

আহমদীয়া খেলাফতের ব্যাপক এবং বিস্তৃত কল্যাণরাজী কখনও গুণে শেষ করা যাবে না। কেউ চাইলে তা কেবল আকাশের তারা গণনার মত ব্যর্থ চেষ্টা হবে। কেউ যদি আকাশের তারা গুণতে শুরু করে তাহলে তারা গুণতে গুণতে রাত শেষ হয়ে যাবে কিন্তু তারা শেষ হবে না। তদ্রুপ খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণরাজী একটা একটা করে বলতে শুরু করলে বলা শুরু করা যাবে কিন্তু বর্ণনা শেষ করা যাবে না। এ কারণে আদেশ পালনার্থে খেলাফতের আহমদীয়ার অশেষ কল্যাণরাজীর নেহায়েত একটা ঝলক তুলে ধরার চেষ্টা করবো মাত্র। এতে হয়তো আপনাদের অতৃপ্তি রয়ে যাবে। বিন্দুতে সিন্দু দর্শনের কষ্ট করতে হবে।

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বৈপবিক কাজ সম্পাদন

খেলাফতে রাশেদার যুগে যেভাবে বিশ্বের এক বিস্তৃত এলাকায় ইসলামের বিস্তার ঘটানো হয়েছে তদ্রূপ খেলাফতে আহমদীয়া বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কাজ করে যাচ্ছে। শুরুতে আহমীয়াত শুধুমাত্র ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল। যা আজ খেলাফতে আহমদীয়র কল্যাণে ২১০ টি দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক দেশ এমন রয়েছে যেখানে প্রথমবারের মত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে। লোকেরা ইসলাম গ্রহনের সুযোগ পেয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ৭০ টি দেশ রয়েছে যেখানে অ-আহমদী মুসলমান রয়েছে। পক্ষান্তরে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ২১০ টি দেশে। অর্থাৎ আজ ১৪০ টির মত অমুসলিম অধ্যুষিত দেশে খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আহমদীয়া খেলাফতের অধীনে বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ২০,০০০ স্থানে ইসলামের তাবলীগ কেন্দ্র চালু রয়েছে। যারা দিনরাত ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে।

গণ্ডগ্রাম কাদিয়ানে আজ থেকে ১২৯ বছর পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে ৪০ জন পবিত্র ব্যক্তিত্বের যে ক্ষুদ্র দলটি আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছিল, বর্তমানে খেলাফতের কল্যাণে তাদের সংখ্যায় ২০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তারা বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

আজ থেকে ১০০ বছর পিছনে যদি চলে যান তাহলে দেখবেন, একটা সময় ছিল যখন খ্রিষ্টান পাদ্রীরা দোর্দণ্ড প্রতাপ ও মহাবিক্রমে সারা দুনিয়া চষে বেড়াত। সর্বত্র তাদের আনাগোনা ও জয়জয়কার ছিল। এতো ব্যাপক ভাবে ত্রিত্ববাদের প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিল, তাদের সাথে মোকাবেলা করার কেউ ছিল না। তারা খালি মাঠে গোল দিয়ে যাচ্ছিল। তখন তাদের শতশত মিশনারী স্কুল ও কলেজ থেকে প্রশিক্ষিত হাজার হাজার মিশনারী বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষকে খ্রিষ্টান বানাচ্ছিল। তখন এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে কোটি কোটি মুসলমান খ্রিষ্টান হয়েছে। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই তখন ২৯ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্টান হয়েছে। এসব কারণে খ্রিষ্টানরা তখন সদর্পে ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছিল, সমগ্র বিশ্বকে খ্রিষ্টান বানানোটা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।

জন হেনরী তার christiniti the world wide religion পুস্তকে লিখেন

"ক্রুশীয় মতবাদের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ যেমন একদিকে লেবানন অন্যদিকে পারস্যের পর্বতমালা এবং বসফরাসের স্বচ্ছ জলরাশিকে আলোক উদ্ভাসিত করেছে, তেমনি অদূর ভবিষ্যতে কায়রো, দামেস্ক এবং তেহরান যিশুখৃষ্টের সেবকবৃন্দ দ্বারা পূর্ণ দেখা যাবে। এমন কি ক্রুশীয় মতবাদ নির্জন আরবের নীরবতা ভঙ্গ করে যিশু খ্রীষ্টের ভক্তবৃন্দের দ্বারা মক্কা নগরীর খাস কাবায় প্রবেশ করবে এবং কাবাগৃহে ক্রুশ ধর্মের অনন্ত জীবনের বাণী উচ্চারিত হবে।"

শুনে কষ্ট লাগতে পারে। কিন্তু আসল বাস্তবতা এটাই ছিল– মুসলমানদের মাঝে কেউ ছিল না খ্রিষ্টানদের মোকাবেলায় দাঁড়ানোর। না ছিল তাদের কোন মিশনারী স্কুল ও কলেজ। তখন দাঁড়িয়েছেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)। দাঁড়িয়েছেন তাঁর বীরপুরুষ খলীফাগণ। তাঁরা একে একে বিশ্বব্যাপী ১৫টি জামেয়া আহমদীয়া অর্থাৎ মুসলিম মুবাল্লেগ, মিশনারী প্রশিক্ষনের ইউনির্ভাসিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এগুলো শুধু মুসলিম দেশে নয়। বরং ৩টি জামেয়ার অবস্থান খ্রিষ্টানদের হৃৎপিণ্ড ইংল্যান্ড, জার্মানী ও কানাডাতে রয়েছে। এসব জামেয়া থেকে শতশত মোবাল্লেগ প্রতি বছর প্রশিক্ষণ নিয়ে ইসলামের ঝাণ্ডা হাতে ইসলাম প্রচারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ছে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ

আহমদী স্বল্প মেয়াদী কোর্স করে অথবা কোন বিশেষ ক্লাস করে অথবা প্রশিক্ষণ নিয়ে তবলীগের কাজে বিশ্বের সর্বত্র ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এ বিষয়টি অন্যরাও আজ অকপটে স্বীকার করে যাচ্ছেন। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ শেখ মোহাম্মদ আকরাম লিখেন, "সাধারণ মুসলমানরা তো তরবারির যুদ্ধের কল্পিত বিশ্বাসে বিভোর ও আত্মহারা। তারা না কর্মের জিহাদ করে, না তবলীগের জিহাদ করে। কিন্তু আহমদীরা অন্য জিহাদকে অর্থাৎ তবলীগকে ধর্মীয় কর্তব্য মনে করে এবং তাতে তারা বিশেষ সাফল্যও অর্জন করেছে।" *(মৌজে কাওসার, পৃ-১৭৯)*

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. এনামুল হক লিখেন, "একমাত্র আহমদী সম্প্রদায় (যাহাদিগকে লোকে সচরাচর কাদিয়ানী আখ্যায় আখ্যাত করিয়া থাকে) ব্যতিত মুসলমানদের মধ্যে অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক বর্তমানে উল্লেখযোগ্যরূপে ইসলাম প্রচারে (ইশায়াত-ই-ইসলাম) মনোযোগী ও তৎপর কিনা বলিতে পারি না। *(শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ, পৃ-৩৪)*

আহমদীদের তবলীগের ফলে আজ দৃশ্যপট সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বল এখন আহমদীদের হাতে চলে এসেছে। আজ ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের তবলীগি কার্যক্রম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে আহমদীদের তবলীগি কার্যক্রম সম্পর্কে সেই ১৯২৬ সালের ২৮ ডিসেম্বরে তনযিম পত্রিকায় অ-আহমদী লেখক ডা. সাইফুদ্দিন কিচলু সাহেব লিখেন, "বর্তমানে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টানদের প্রচারের মোকাবেলায় একমাত্র আহমদী সংগঠনের তাবলীগকেই দাঁড় করান যায়। কিন্তু ত্যাগ-তিতীক্ষা, আনুগত্য ও উৎসাহের দিক দিয়ে খ্রিষ্টানদের সংগঠন জামা'তে আহমদীয়ার ধারে কাছেও পৌঁছাতে পারবে না।"

আফ্রিকা যেখানে তাদের একছত্র আধিপত্য ছিল, সেখান থেকেও তারা আজ লেজ গুটিয়ে নিয়েছে। সেখানে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের আজ জয়জয়কার। এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য, "আপনারা যদি আফ্রিকার ঘটনাবলীর প্রতি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন ইসলাম প্রচারকদের একটি ক্ষুদ্র দল অত্যন্ত সীমিত সম্পদ নিয়ে লোকদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে।" *(পাকিস্তান টাইমস, ৯ই মে, ১৯৬৩ইং)*

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্রিষ্টান অধ্যাপক S. G. Willmson Zvui Christ or Muhammad পুস্তকে লিখেন, "ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকূলবর্তী এলাকায় আহমদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করছে। শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের সকল অধিবাসীদের খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হবে। এই বিপদ চিন্তাতীতরূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহমদীয়াতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে চলেছে এবং নিশ্চয়ই তা খ্রিষ্টধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। এটি ঠিক করে বলা যাবে না, ক্রুশ অথবা হেলাল কে আফ্রিকা শাসন করবে।"

খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ খ্রিষ্টমতবাদের ঘাঁটি ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াতেও খ্রিষ্টানরা স্বস্তিত নেই। সেখানেও তারা আজ কোনঠাসা হয়ে পড়ছে। দলে দলে লোক আহমদীদের তবলীগে মুসলমান হয়েছে, হচ্ছে। এখানেও আমরা বিজয়ী হবো ইনশা আল্লাহ্।

এ বিষয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) বলেন, "আমি ইউরোপকে বলে দিয়েছি, আমরা বিজয়ী হব। পরিশেষে বিজয় আমাদের হবে। আগামী শতাব্দীর মধ্যেই সারা বিশ্বের ধর্ম ইসলাম হবে। ইসলাম বিজয় লাভ করবে।"

বর্তমানে আমরা এই বিজয়ের শতাব্দীতে আছি। ইনশাআল্লাহ্ এই বিজয় আমরা দেখব। ইতিমধ্যে এটা দৃষ্টিগোচর হতেও শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত দার্শনিক ও লেখক জর্জ বানার্ডশো এর স্বীকারোক্তি হল, "Alreadz even at the present time, manz of my own people and of Europe as well have come over to the faith of Muhammad. And the Islamisation of Europe maz be said to have begun." (On Getting Married)

ভাষান্তর: ইতিমধ্যে, বর্তমান সময়ে আমার দেশের তথা ইউরোপের বহু অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং একে ইউরোপের ইসলামীকরণের সূচনা বলা যেতে পারে।

বিশ্বব্যাপি মসজিদ নির্মাণ

বিশ্বব্যাপি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রেও খেলাফতে আহমদীয়ার অবদান অতুলনীয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে খেলাফতের তত্ত্বাবধানে ইসলাম নতুন নতুন দেশে বিস্তার লাভ করেছে। এরপর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বিস্তৃত এলাকায়ে মসজিদ নির্মাণ করেছে। তারপর একটা সময় এমন এসেছে যখন একদিকে মুসলমানরা ইউরোপের এসব মসজিদ ফেলে দিয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। তখন অপরদিকে খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়েছে। পৃথিবীর আনাচে কানাচে রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় হাজার হাজার গির্জা বানিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দেয়ার কেউ ছিল না।

কিন্তু বর্তমানে খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে ইসলাম তার হারানো সেই গৌরব ফিরে পেয়েছে। আহমদীয়া জামা'ত এখন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ১৮ হাজারের বেশি মসজিদ নির্মাণ করেছে। অমুসলিম দেশগুলোতে এবং বিশের বড় বড় বিখ্যাত অমুসলিম শহরগুলোতে মসজিদ নির্মাণ করে চলেছে। বার্লিন, লন্ডন, কোপেনহেগেন, ব্রাসেলস, হামবুর্গ, ফ্রাঙ্কফুট, হেগ, গুটেনবার্গ, জুরিখ, ওকল্যাণ্ড, অসলো, ক্যালিফোর্নিয়া, পোর্টল্যাণ্ড, আরিজোনা, ত্রিনিদাদ, সুরিনাম, নান্সপিট, রিও দি জেনেইরো প্রভৃতি শহরে আহমদীরাই সর্বপ্রথম মসজিদ বানিয়েছে। জার্মানী, ইংল্যাণ্ডে ও ইউরোপের দেশগুলোতে আহমদীয়া জামা'ত আজ শত শত মসজিদ ইতিমধ্যে নির্মাণ করেছে।

অসংখ্য গির্জাকে ক্রয় করে আজ সেখানে মসজিদ বানানো হচ্ছে। খেলাফতের কল্যাণে আহমদীরা আজ লন্ডনে পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ বায়তুল ফুতুহ নির্মাণ করেছে। প্রায় ১০ হাজার লোক এতে নামাজ পড়তে পারে। ৭৫০ বছর পূর্বে যে স্পেন থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, মসজিদগুলোকে গির্জা ও মিউজিয়াম বানানো হয়েছিল, সেই স্পেনেও আবার আহমদীয়া খেলাফত প্রথম মসজিদ বানিয়েছে। এমনকি ইতিমধ্যে একাধিক মসজিদ বানিয়ে ফেলেছে।

কুরআনের অতুলনীয় সেবা

লোফতে রাশেদার যুগে কুরআনের অতুলনীয় সেবা করা হয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে বিভিন্ন যুদ্ধে হাজার হাজার হাফেজে কুরআন শহীদ হন। তখন আশংকা দেখা দেয় এভাবে হাফেজে কুরআনরা শহীদ হলে কুরআন সংরক্ষন কিভাবে হবে? হযরত উমর (রা) হযরত আবু বকর (রা.)-কে পরামর্শ দেন কুরআনকে এক সাথে একত্র করে পুস্তক আকারে সংকলনের জন্য। প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.) অসম্মতি জানান। বলেন যে কাজ আল্লাহ্‌র রসূল করেন নি তা আমি কিভাবে করি। পরে সম্মত হন। আল্লাহ্‌র রসূলের যুগে যারা নাযিলকৃত ওহী সাথে সাথে লিখার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন তাদের তিনজনকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়।

পরবর্তীতে দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন নতুন যারা মুসলমান হচ্ছিল তারা আঞ্চলিক উচ্চারণে কুরআন পাঠ করছে। ফলে ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রা.) এই মূল কপির অনুকরণে আরো নয়টি কপি করে সেটা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠান।

তদ্রুপ কুরআনের জ্ঞান উন্মোচন, কুরআনের প্রচার, কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রেও খেলাফতে আহমদীয়ার অবদান স্বর্নাক্ষরে লিখে রাখার মত। খেলাফতের কল্যাণে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত এখন পর্যন্ত ৭৬ টি ভাষায় কুরআনের পূর্নাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আরও প্রায় অর্ধশত ভাষায় অনুবাদ প্রকাশের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া ১২০টি ভাষায় কুরআনের নির্বাচিত অংশের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। বিগত ১৪শত বছরে অর্থাৎ ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম জাহান মাত্র ১৪টি ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। আর ১৯৩৬ সাল থেকে ২০১৮ পর্যন্ত মাত্র ৮২ বছরে আহমদীয়া জামা'ত ৭৬ টি ভাষায় অর্থাৎ পূর্বে চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি ভাষায় কুরআন অনুবাদ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছে। ভাষাগুলো হল– বাংলা, আলবেনিয়ান, অহমিয়া, বুলগেরিয়ান, চাইনিজ, চেক, ডাচ, ডেনিশ, ইংলিশ, ইস্পারেন্টো, ফিজিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, গ্রীক, গুজরাটি, গুরুমুখী, হাউসা, হিন্দি, ইগবো, ইন্দোনেশিয়ান, ইটালিয়ান, জাপানীজ, কিকুউ, কোরিয়ান, লুগাণ্ডা, মালয়ী, মালায়ালাম, মনিপুরী, মারাঠি, মেণ্ডি, ওড়িয়া, পার্শিয়ান, পুশতু, পোলিশ, রাশিয়ান, পর্তুগীজ, পাঞ্জাবী, সারাইকী, সিন্ধী, স্পেনিশ, সোয়াহিলি, সুইডিশ, তাগালোগ, তামিল, তেলেগু, তুর্কি, তুভালু, উর্দু, ভিয়েতনামিজ, ইউরোবা, নওরোজিয়ান, ফান্টী, সুদানী, কাশ্মিরী, কিকাম্বা, বার্মিজ, মাউরী, থাই, নেপালী, জুলা, কেটোলান, কেনেডা, কেরল, উজবেক, ফুলা, মানদিনকা, ওলফ, বসনিয়ান, মালাগাসি, অশান্তি, কেরিওল প্রভৃতি।

এ ছাড়া আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাগণ আমাদের ধরে ধরে কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের গুপ্ত ভান্ডার, নতুন নতুন জ্ঞান আমাদের সামনে উন্মোচন করেছেন। প্রথম খলীফার তফসীর হাকায়েকুল ফুরকান, দ্বিতীয় খলীফার তফসীরে কবীর ও সগীর, আনওয়ারুল উলুম নামে প্রায় সাড়ে চারশ বইয়ের সংকলন। চতুর্থ খলীফার তফসীরে কুরআন, দরসুল কুরআন, বিশ্বশান্তি, Revolation rationalitz knowledge and truth আর প্রত্যেক খলীফার জুমআর খুতবা পবিত্র কুরআনের এক বিস্ময়কর জ্ঞান ভাণ্ডার। এর চেয়ে সমৃদ্ধ ও যুগ উপযোগী তফসীর আর কেউ দেখাতে পারবে না।

তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার

তথ্যপ্রযুক্তিকে ইসলামের কাজে ব্যবহার এটাও আহমদীয়া খেলাফতের এক বিশেষ কল্যাণ। এ ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা রেখেছে এমটিএ (মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া)। ৩টি স্বতন্ত্র চ্যানেল ও ৮টি অডিও সম্মলিত এই টিভি চ্যানেলটি ২৪ ঘন্টা বিরামহীনভাবে সারা বিশ্বে খাঁটি ইসলামের বাণী প্রচার করে যাচ্ছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামের বাণী জানার, বুঝার ও মানার সুযোগ পাচ্ছে। আজ পৃথিবীর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে ইসলামের বাণী পৌঁছাচ্ছে না।

এমটিএ এই কাজের পাশাপাশি আরও একটি গুরত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে। আর তা হল– আপনারা সবাই জানেন, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ ও ১৯৮৪ ইং সালে জঘন্যতম ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। যে কারণে অবশেষে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফাকে হিজরত করতে হয়েছিল। এতে বিরুদ্ধবাদীরা সেদিন খুবই খুশি হয়েছিল। তারা মনে করেছিল আহমদীদেরকে তারা খলীফা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পেরেছে। কিন্তু এমটিএ'র কল্যাণে এ ষড়যন্ত্র সফল হয় নি। তাদের আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। আজ প্রতিনিয়ত আহমদীরা তাদের খলীফাকে দেখছে এবং তাঁর কথা শুনতে পাচ্ছে। ঘরে বসেই তাৎক্ষণিক দিক-নির্দেশনা সরাসরি পেয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোতে রেডিও-এর মাধ্যমেও আহমদীয়া জামা'ত ইসলামের তবলীগ করে যাচ্ছে। এসব দেশে রেডিও অনুষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তাও লাভ করেছে।

অনুরূপভাবে ইন্টারনেট, ইউটিউব, ফেইজবুক, স্কাইপের মাধ্যমেও খেলাফতের কল্যাণে আহমদীরা ইসলাম

প্রচারের কাজ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র alislam.org ওয়েবেই মুল ইংরেজী ছাড়াও আরও ৩২ ভাষায় browsing করার সুযোগ পাচ্ছে। এ ছাড়া প্রত্যেক দেশের অংগ-সংগঠনগুলোর আলাদা আলাদা ওয়েব সাইট তো রয়েছেই।

প্রিন্ট মিডিয়া

খেলাফতের কল্যাণে প্রিন্ট মিডিয়াতে ব্যাপক কাজ হচ্ছে। আহমদীয়া জামা'ত ১৭ টি ভাষায় বিভিন্ন দেশে ৭৮টি পত্রিকা প্রকাশ করে ইসলাম প্রচার করে যাচ্ছে। এছাড়াও খেলাফতের তত্ত্বাবধানে প্রতি বছর বিভিন্ন ভাষায় কোটি কোটি বই ও লিফলেট প্রকাশ করে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের কাছে ইসলামের বাণী প্রচার করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

খেলাফতে আহমদীয়ার কল্যাণে আজ জামা'তে আহমদীয়া অর্থনৈতিকভাবেও সমৃদ্ধ। আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে যখন লাহোরী জামা'তের সদস্যরা বায়তুল মালের সমস্ত অর্থ নিয়ে লাহোরে চলে যায়, তখন খলীফার হাতে, বায়তুল মালে মাত্র ১৪ আনা ছিল। আর ১৮হাজার রুপি ঋনের বোঝা ছিল। আজ আমাদের পঞ্চম খলীফার অধীনস্ত বায়তুল মালে প্রতি বছর হাজার কোটি টাকারও বেশি জমা হচ্ছে।

আজ থেকে ৩৪ বছর পূর্বে পাকিস্তানের একজন সৈরশাসক অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে ঘোষণা দিয়েছিল– আমরা আহমদীয়া খলীফার হাতে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেব। রাবওয়াবাসীরা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাবওয়ার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু আজ ৩৪ বছর পর খেলাফতের কল্যাণে আহমদীয়াতের বর্তমান যে অবস্থান তা দেখার মত। বর্তমানে রাবওয়া পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পাকিস্তানের সবচেয়ে ধনী শহর হিসেবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শিক্ষিত শহর হিসেবে স্বীকৃত, সবচেয়ে শান্তিপ্রিয় শহর হিসেবে স্বীকৃত। তৃতীয় বিশ্বের দেশ পাকিস্তানের শহর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে সদকা দেওয়ার জন্য লোক খুজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে পাকিস্তানের চলতে হয় অন্যের সাহায্য নিয়ে, ঋন নিয়ে, ভিক্ষা নিয়ে। নিজেদের দেশ চালানোর জন্য অন্যের সাহায্যের উপর, ভিক্ষার উপর নির্ভর করতে হয়। ২০১৩ সনের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী তাদের দেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপর গড়ে ১,১৫,০০০ টাকার ঋনের বোঝা রয়েছে। (২০১৭ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে) অর্থাৎ পাকিস্তানের প্রত্যেকটি শিশু ১,১৫,০০০ টাকা ঋনের বোঝা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে খেলাফতের কল্যাণে আজ শুধু পাকিস্তানে নয় বিশ্বের কোথাও আহমদীদের ক্ষুধার্ত দিন কাটাতে হয় না। কোথাও আহমদী কোন ভিক্ষুক নেই। টাকার অভাবে গরীব ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয় না, গরীব-মেয়েদের বিয়ে আটকে থাকে না। বস্ত্র, বাসস্থানহীন দিনের পর দিন কাটাতে হয় না।

খেলাফতের এ কল্যাণ আজ শুধু আহমদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আফ্রিকা ও বিশ্বের অন্যান্য জায়গার অনেক গরীব মানুষ প্রতিনিয়ত খেলাফতের কল্যাণ ভোগ করছে। খেলাফত অধিনে আফ্রিকা মহাদেশে নুসরত জাঁহা স্কীমের আওতায় গরীব মানুষের পড়া-লেখার ব্যবস্থা করার জন্য ৫১০ টি স্কুল কাজ করে যাচ্ছে। ১২টি দেশে ৪২টি হাসপাতাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও তাদের জন্য পানি, বিদ্যুৎ, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। হিউমিনিটি ফার্স্ট খেলাফতের আরেক কল্যাণের নাম। যেখানে মানবতা বিপন্ন হয়, মানুষ দূর্যোগ ও দূর্ভোগের শিকার হয়। সেখানে দূর্গতের পাশে সাহায্যেও জন্য গিয়ে দাঁড়ায় হিউমিনিটি ফার্স্ট। এক্ষেত্রে ধনী-গরীর কোন বাধ বিচার করা হয় না। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যখন আমেরিকা ও কানাডাতে ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা ও সানডি, জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামী, পাকিস্তানে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ বন্যা, হাইতিতে ভূমিকম্প, ইন্দোনেশিয়াতে সুনামী, বাংলাদেশে আইলা ও সিডর আঘাত হানে তখন ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়ায় হিউমিনিটি ফার্স্ট। এছাড়াও বসনিয়া, নাইজার, নাইজেরিয়া ও সিরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা যখন জাতিগত সহিংসতায় বিপর্যস্থ তখন হিউমিনিটি ফার্স্ট তাদের পাশেও গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি অতি সাম্প্রতিক রোহিঙ্গাদের ব্যাপক খাদ্য ও চিকিৎসা সাহায্য করা হয়েছে।

মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা

খাতামান্নাবীঈন, সায়্যেদুল মুরসালিন মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা, তাঁর প্রতি যে কোন ধরনের আক্রমন প্রতিহত করা, তাঁর মহান শিক্ষা ও আদর্শকে জগতের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আহমদীয়া খেলাফত সদা সোচ্চার। এ ক্ষেত্রে তাঁরা অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় কাজ করে যাচ্ছেন।

আমাদের দ্বিতীয় খলীফার যুগে মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করে 'রঙ্গিলা রসূল' নামে একটি প্রবন্ধ লেখা হয়। হুযূর (রা.) তখন রসূল (সা.)-এর জীবনী ব্যাপকভাবে আলোচনার জন্য সীরাতুন্নবী (সা.) জলসার প্রবর্তন করেন। ১৭ জুন ১৯২৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপন করেন।

খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে সালমান রুশদী 'সেটানিক ভার্সেস' নামে এক নোংরা পুস্তক লিখে। হুযূর (রাহে.) তার প্রতিবাদে জুমুআর খুতবা প্রদান করেন, পুস্তক লিখেন। পুস্তকে দাতভাঙ্গা জবাব দেন।

খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর যুগে ২০০৬ সালে পোপ ষোড়শ বেনেডিক্ট রসূল (সা.)-কে কটাক্ষ করেন। একই বছর ডেনমার্কের একজন কার্টুনিষ্ট রসূল (সা.) নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র লিখে। হুযূর (আই.)-এর প্রেক্ষিতে ৫ টি জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। আহমদীদের সংশিষ্ট পত্রিকাগুলোতে গণসংযোগ করতে, প্রবন্ধ লিখতে নির্দেশ দেন। ডেনমার্কের মুবাল্লেগ সাহেব ঐ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে পাঠান। প্রবন্ধ ছাপা হয়। পরবর্তীতে মোবাল্লেগ

সাহেবকে সাংবাদিকদের আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তিনি সেখানে তাঁর জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। কার্টুনিষ্ট বলতে বাধ্য হয়, এমন আলোচনা পূর্বে হলে আমি কার্টুন লিখতাম না।

২০১২ সালে the innocence of muslims নামে একটি নোংরা সিনেমা বানানো হয়। হুযূর (আই.) ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর জুমুআর খুতবায় এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেন। হুযূর (আই.) আহমদীদেরকে রসূল (সা.)-এর আর্দশ বেশি বেশি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার আহবান জানান।

খেলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ ও সুরক্ষিত দূর্গ

খেলাফতে আহমদীয়া আমাদের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়, এক সুরক্ষিত দূর্গ। মুরগী যেমন বিপদের সময় মা মুরগীর ডানার নিচে আশ্রয় দিয়ে তার বাচ্চাদের সুরক্ষিত রাখে, তেমনি খেলাফতে আহমদীয়ার ছায়া তলে আমরা প্রতিটি কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদেও সুরক্ষিত রয়েছি।

১৯১৪ ও ১৯৩৯-৪৫ সালে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ হয়েছে। বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের প্রাণহানী ও ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছে। কিন্তু আমরা আহমদীরা সুরক্ষিত রয়েছি। জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে বিশ্বের কোন না কোন স্থানে সংঘর্ষ, যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই রয়েছে। আহমদীরা এসবের মধ্যেও নিরাপদ রয়েছি। আজ মুসলমানরা ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া, সিরিয়া ও পাকিস্তানে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ করে মরছে। অপরদিকে পশ্চিমাদের কাছে টেরোরিষ্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়ে মার খাচ্ছে। কোথায়ও তাদের শান্তি নাই। কিন্তু আমরা সব জায়গায় নিরাপদ রয়েছি।

অপরদিকে আহমদীয়াতের শত্রুরাও নিরবে বসে নেই। তারা অবিরাম আহমদীয়াতের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। ১৯৩৪ সালে মজলিসে আহরার, ১৯৫৩ সালে মওদুদীর নেতৃত্বে জামা'তে ইসলামী আমাদের মিটানোর সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ১৯৭৪ সালে জুলফিকার আলী ভূট্টো, ১৯৮৪ সালে জেনারেল জিয়াউল হকও জামা'তকে ধ্বংস করার শেষ চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রীয় শক্তি ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। কিন্তু এরপরও তারা ব্যর্থ হয়েছে। খেলাফতের গায়ে আঁচ পর্যন্ত লাগাতে পারে নি। আহমদীয়া জামা'তের অগ্রগতিকে থামাতে পারে নি।

খলীফা দোয়ার এক জীবন্ত ভাণ্ডার

খলীফা আমাদের জন্য দোয়ার এক মূর্তমান, অফুরন্ত ও জীবন্ত ভাণ্ডার। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, "তোমাদের জন্য একজন আছেন, যিনি তোমাদের ব্যথা হৃদয়ে রাখেন। তোমাদের ভালোবাসেন, তোমাদের দুঃখ বোঝেন। তোমাদের কষ্টকে নিজের কষ্ট মনে করেন। তোমাদের চিন্তায় তিনি অস্থির থাকেন। তোমাদের কষ্ট দূর করার জন্য তিনি আপন প্রভুর সমীপে ছটফট করতে থাকেন।" *(বারাকাতে খেলাফত, আনওয়ারুল উলুম, খ-২, পৃ-১৫৬)*

চৌধুরী হাকীম দীন সাহেব বর্ননা করেন। আমার স্ত্রী তার প্রথম বাচ্চা জন্মের সময় খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। ঐ কষ্টকর পরিস্থিতিতে রাত ১২টার সময় আমি খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর বাসায় গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ি। শব্দ শুনে হুযূর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন কে? আমি অনুমতি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে পুরো ঘটনা বলি ও দোয়ার আবেদন করি। হুযূর (রা.) তৎক্ষনাৎ উঠে গেলেন। ভেতর থেকে একটি খেজুর আনলেন, দোয়া করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। বাচ্চা যখন হবে তখন আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমি ফেরত এসে স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চা হয়ে যায়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, এত রাত হয়েছে এখন হুযূর (রা.)-কে গিয়ে জাগানো ঠিক হবে না। আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ফজরের নামাজের সময় উপস্থিত হয়ে হুযূর (রা.)-কে সংবাদ দেই। হুযূর (রা.) বলেন– মিয়া হাকীম দীন! তুমি তোমার স্ত্রীকে খেজুর খাইয়ে দিয়েছ, তোমার স্ত্রীর বাচ্চা প্রসব হয়ে গেছে। তোমরা দু'জন আরামে ঘুমিয়ে গেছ। আমাকে যদি সংবাদ পাঠাতে তাহলে আমিও আরামে ঘুমাতে পারতাম। আমি তো সারা রাত জেগে তোমার স্ত্রীর জন্য দোয়া করেছি।"

আমাদের খলীফা সমগ্র জগতের আস্থাবান নেতা

আল্লাহ্‌র খলীফারা কেমন হয়ে থাকেন দেখুন। তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণের উৎস হন। মুসলিম অমুসলিম সবার আশা আকাঙ্খার কেন্দ্রস্থল হন। সবার আরাধনার বস্তু হন। শান্তির দূত হন। তারা যেখানে যান সেখানে শান্তির বাণী নিয়ে যান। খেলাফতের ছায়া পেলে মুসলিম অমুসলিম সবাই স্বস্থি পায়, আনন্দিত হয়। হাত তোলে খোদার কাছে, ঈশ্বরের কাছে তার উন্নতি কামনা করে তার জন্য মন উজার করে দোয়া করে।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর আগে খেলাফতে রাশেদার যুগ দেখুন- বিদ্রোহ, উস্কানী ইত্যাদির কারণে হযরত উমর (রা.)-এর যুগে পারস্যে অভিযান প্রেরণ করতে হয়েছিল। সেনাপতি একটা বিশাল অংশ দখল করার পর হযরত উমর (রা.)-কে বার্তা পাঠালেন আমাদের সামনে একটি নদী রয়েছে। আপনি অনুমতি দিলে নদী পার হয়ে বাকি অংশটাও জয় করে নিতে পারি। হযরত উমর (রা.) বলে পাঠালেন আর নয়। এই নদী যেন আমার আর পারস্যবাসীদের মাঝে আগুনের প্রাচীররূপে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আর দখল চাই না, আমরা মানুষের রক্ত চাই না, আমরা শান্তি চাই।

আরেকবার ফিলিস্তিনে যুদ্ধ হচ্ছে। শত্রুপক্ষ খ্রিষ্টানরা কেল্লার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছে। পরাজিত করা যাচ্ছিল না। তারা সংবাদ পাঠালো আমরা আত্মসর্মপন করবো যদি খলীফা উমর (রা.) নিজে আসেন। সংবাদ পেয়ে খলীফা ছুটে আসলেন। রক্তপাতহীন বিজয়ের পথটাকে বেছে নিলেন।

নামাযের সময় হলে খ্রিষ্টানরা তাকে তখন তাদের হেকেলে সুলায়মান অর্থাৎ

টেম্পলের ভিতরে নামায পড়তে বলে। তিনি সেখানে পড়েন নি। বরং তিনি এর চারপাশের বাউণ্ডারীরও বাহিরের একটি জায়গা যেখানে ময়লা ফেলা হতো সেটা পরিস্কার করান এবং সেখানে নামায পড়েন। তার ভয় ছিল এখন আমি এখানে নামায পড়লে পরে মুসলমানরা এই অজুহাত দিয়ে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। আর তার এ আশংকা পরে সত্যি হয়েছে। তিনি যেখানে নামায পড়েছেন সেখানে মসজিদে উমর নামে একটি মসজিদ বানানো হয়েছে। যেটির অবস্থান হেকেলের প্রাচীর ঘেষে।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে জেরুজালেমেরই একটি এলাকা ছেড়ে মুসলমানদেরকে চলে আসতে হয়। তখন উমরের নির্দেশে তাদের নিরাপত্তার জন্য যে জিজিয়া কর নেয়া হয়েছিল। এটা ফেরৎ দেয়া হয়। তারা খ্রিষ্টান ছিল। তারা জিজ্ঞেস করে এ টাকা কেন ফেরৎ দিচ্চ? বলা হল– আমরা এ শর্তে টাকা নিয়েছিলাম তোমাদের নিরাপত্তা দিব। কিন্তু এখন যেহেতু তোমাদের নিরাপত্তা দিতে পারছি না তাই আমাদের খলীফার নির্দের্শে এটা আমরা ফেরৎ দিচ্ছি। তারা অবাক হল। কোন বাদশা টাকা নিলে ফেরৎ দেয় এটা তো দেখি নি। এমনকি আমাদের স্বজাতির লোকেরা এটা কখনও করে না। তখন আবেগে তারা কাদলো। আর হাত তোলে দোয়া করলো। হে ঈশ্বর! তুমি এদের মঙ্গল কর। এদের মত শাসককে তুমি অচিরেই আমাদের মাঝে ফিরিয়ে নিয়ে আস।

ইসলামের খলীফার, আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফার মঙ্গল বিধর্মীরাও চায়। তারা তার উন্নরিতর জন্য দোয়া করে। তারা তার দাসত্ব বরনে আনন্দিত হয়।

এই দৃশ্যটিকে সামনে রাখুন। আর আইসিস এর স্বঘোষিত রক্তপিপাসত খলীফা এবং জামা'তে আহমদীয়ার খলীফাকে দেখুন। তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন কে আল্লাহ্‌র খলীফা?

আবু বকর আল বাগদাদী ও তার বাহিনী যেখানে যাচ্ছে রক্তের বন্যা বহাচ্ছে। ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে পুরুষ মহিলাকে হত্যা করছে, পুরিয়ে মারছে, দেশান্তরিত করছে, মহিলাদের উপর পাশবিক নির্যাতন করছে। ফলে স্বজাতি বিজাতী সব মানুষ তাদের ধিক্কার জানাচ্ছে। তাদের ধ্বংস কামনা করছে। ধ্বংস করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবাই বিশ্বশান্তির জন্য তাদেরকে হুমকি মনে করছে।

পক্ষান্তকে আহমদীয়া খেলাফতের বিষয়টি দেখুন! প্রাশ্চাত্য যারা সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। যারা সারা বিশ্বের পলিসি মেকার নীতিনির্ধারক। যারা তৃতীয় বিশ্বের লোকদের মানুষই মনে করে না। যারা নিজেদেরকে পৃথিবীর হর্তা-কর্তা মনে করে। তারা অর্থাৎ এই পশ্চিমা জগত যখন অর্থনৈতিক মন্দায় জর্জরিত হয়ে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিয়ে অথবা এই সন্ত্রাসের শিকার হয়ে, বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। পরিস্থিতি দিনদিন শুধু খারাপই হচ্ছে। তারা এ থেকে মুক্তির পথ খুজে পাচ্ছে না। তখন এই অবস্থা থেকে নিজেদেরকে উত্তরণের জন্য, মুক্তির জন্য কি শিক্ষা হওয়া দরকার? কি নীতি হওয়া দরকার? কি প্রদক্ষেপ নেয়া দরকার। এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা লাভের জন্য– তারা আমাদের প্রাণপ্রিয় খলীফা হযরত মাসরুর আহমদ (আই.)-কে রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়ে, তারা তাদের পার্লামেন্টে বক্তব্য রাখার আমন্ত্রন জানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যার ফলে হুযূর (আই.) গত ৩০ মে ২০১২ সনে জার্মানীর মিলিটারী হেডকোয়াটারে, ২৭ জুন ২০১২ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটাল হিলে, ৪ ডিসেম্বর ২০১২ সনে ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টে ৩০টি দেশের ৩৫০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে এবং ১১ জুন ২০১৩ সনে যুক্তরাজ্যের হাউজ অপ পার্লামেন্টে বক্তব্য রেখেছেন।

হুযূর (আই.) তাঁর বক্তব্যে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জোরালো ভাবে তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে তাদের ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ নীতিগুলো দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাশ্চাত্যের ডাবল স্টেণ্ডার অর্থাৎ দ্বৈত নীতির কড়া সমালোচনা করেছেন। বিশ্বশান্তির জন্য, তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাগুলোকে তুলে ধরে এ গুলোকে গ্রহণ করার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতা চলাকালে, বক্তৃতার শেষে তারা করতালী বাজিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। তারা পিনপতন নিরবতায় হুযূর (আই.)-এর বক্তব্য মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনেছে। হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতার শেষে তাদের অভিব্যক্তি বর্ণনায় তারা হুযূর (আই.)-এর বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। অকপটে মেনে নিয়ে নিয়েছে– এই বক্তব্যের শিক্ষাই সর্বোত্তম শিক্ষা। এটাই তাদের নীতি হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্বের মানুষ, মিডিয়া হুযূর (আই.)-কে **'ম্যান অব পিস'** বলে আখ্যায়িত করছে। আজ পাশ্চাত্বের বিভিন্ন শহরের চাবি হুযূর (আই.)-এর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে।

অনেকে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশ্বব্যাপী বিজয় দেখতে চায়। প্রশ্ন করে, কোথায় ইমাম মাহদী বিশ্ব বিজয় করলেন। আজ তারা যদি অন্ধ না হন, তাহলে বলছি সামনে তাকান আর দেখেন। আমরা আজ ঐ বিজয়ের মাহিন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। পশ্চিমা জগত এখনও না মানলেও দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করেছে– আজ ইসলামের খলীফার মত নেতা, ইসলামের শিক্ষার মত আদর্শ তাদের হওয়া উচিত। তাই আমরা বিশ্বাস করি সেই দিন আর বেশি দূরে নয় অতি সন্নিকটে, যেদিন এই স্বীকৃতিই তাদের বিশ্বাসে রূপান্তরিত হবে। তারাও খলীফাকে মেনে নিবে। ইসলামের অনুসারী হবে। খেলাফতের আশীষ ও কল্যাণ তারাও লাভ করবে।

শুরুতে যে আয়াত তিলাওয়াত করেছি এতে আল্লাহ্ তালা ঘোষণা দিয়েছেন,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي الۡاَرۡضِ

আল্লাহ্ তা'লা অঙ্গিকার করেছেন, যারা ঈমান আনয়নকারী হবে, সৎকর্মশীল হবে, তিনি তাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। এই অঙ্গিকার অনুযায়ী আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে সায়্যেদুল

মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, খাতামান্নাবীঈন হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম যাঁদের ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

অর্থাৎ তাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট, আর তারা আল্লাহ্ প্রতি সন্তুষ্ট, সেই সাহাবাদের মাঝে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

আহমদীয়া খেলাফতের সর্বপ্রথম নিয়ামত হল– খিলাফত আমাদের মত অযোগ্য, দুর্বলদেরকে এক বিরল সম্মানে ভূষিত করেছে। আর তা হল আল্লাহ্‌র ওয়াদা ছিল– যারা ঈমান আনয়নকারী এবং সৎকর্মশীল হবে তাদের মাঝে তিনি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র আমাদের মধ্যে খিলাফত রয়েছে। তাই এই খেলাফত প্রমান করেছে–

প্রথমত, এ যুগে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে আমরাই ঈমান আনয়নকারী ও সৎকর্মশীল।

দ্বিতীয়ত, খেলাফত শুধুমাত্র সাহাবীদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত ছিল আর কারো মাঝে ছিল না। বর্তমানে রয়েছে শুধু আমাদের মাঝে। তাই আমাদের মাঝে খেলাফত থাকাটা প্রমাণ করে, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ঘোষণা-

وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

অর্থাৎ পরবর্তীতে এমন একটা দল আসবে যারা সাহাবীদের মধ্যে গণ্য হবে। নিঃসন্দেহে আমরাই সেই দল। যারা পরে এসেও সাহাবীদের মাঝে গণ্য হবার বিরল সম্মানে ভূষিত। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহারিক সাক্ষ্য ও সমর্থন আমাদের সপক্ষে বিদ্যমান।

আমি সবশেষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। হুযূর (আ.) বলেন- "খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, 'তোমাদের প্রতি আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করা হবে। এমন কি সম্রাটগণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ খুজবে।"

"আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র "আহমদী" পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিক- নির্দেশনা দেয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার প্রকাশক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **আলহাজ্ব মাহবুব হোসেন**
প্রকাশক, পাক্ষিক আহমদী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

কবিতা

দাজ্জাল বধ

সব মুসলমানরাই বিশ্বাস করেন
আসিবেন ঈসা নবীউল্লাহ্।
ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শুকর বধ করবেন,
যুদ্ধ রোহিত করবেন,
বলে গেছেন– রসূলুল্লাহ্ (সা.)।
সারা বিশ্বে প্রধান্য বিস্তার করেছে–
কানা দাজ্জাল।
তার পার্থিব মায়াজালে ভুলেছে মুসলমান।
তারা আধ্যাত্মিকতা দিয়ে বিসর্জন–
বরণ করে নিয়েছে ....পার্থিব জীবন।
মুসলমানরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে তবে-
কুড়িয়েছে লাঞ্ছনা, অপমান ভরে।
ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ন্যায় বিচারক,
মীমাংসাকারী হয়ে করেছেন আগমন।
তৃত্ববাদ-তথা দাজ্জালিয়তের করেছেন খণ্ডন ।
প্রমাণ করেছেন তিনি ইসলামই চিরস্থায়ী দ্বীন।
মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সা.) খাতামান্নবীঈন।
তাঁকে (সা.)-কে আল্লাহ্ পাক,
প্রস্রবণ– করেছেন দান।
কিয়ামত কালাবদি যার ধারা চির বহমান।
ইমাম মাহদী (আ.) মুহাম্মদী উম্মত
ঈসা ইবনে মরিয়ম হন।
তিনি ইস্রাঈলী ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) নন।
অসংখ্য সাদৃস্যের কারণে তার (আ.) এই খেতাব।
মুহাম্মদী ফয়েজের বাইরে কোন ফয়েজ নাই
ঘোষণা করেছে খাতামুন কিতাব।

***

বিবাহ-শাদী এবং আমাদের করণীয়

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

বিবাহের ঘোষণায় পঠিত মসনূন আয়াতসমূহ:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۲﴾

হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর, যিনি একই সত্তা থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন নিবেদন করে থাক, (বিশেষভাবে) রক্ত-সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে (তাকওয়া অবলম্বন কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের পর্যাবেক্ষক। *(সূরা আন নিসা: ২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۙ﴿۷۱﴾
يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ؕ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿۷۲﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সহজ-সরল-স্বচ্ছ কথা বল; তাহলে তিনি তোমাদের আচরণ শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। আর যে কেউ আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের আনুগণ্য করে সে নিশ্চয় অনেক বড় সাফল্য লাভ করে। *(সূরা আল আহযাব: ৭১-৭২)*

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ
مَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۹﴾

হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। আর প্রত্যেকেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, সে আগামীকালের জন্য অগ্রে কী প্রেরণ করছে। আর আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবিশেষ অবহিত। *(সূরা আল হাশর: ১৯)*

হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ আল খামেস (আই.) ১০ নভেম্বর ২০০৬-এর জুমুআর খুতবার একস্থলে বলেন–

"আমি আগেও বলেছি, নিকাহ্‌র ঘোষণাকালে কুরআন শরীফ প্রদত্ত উপদেশাবলী স্মরণ রাখুন, তাকওয়া অবলম্বন করুন, সহজ-সরল ও স্যু কথা বলুন, তাহলে কোন ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হবে না। আপনারা অন্যায়ভাবে যা অর্জন করবেন তা মিথ্যাচারের অন্তর্ভুক্ত আর মিথ্যার সাথে আপনারা শির্ক করার অপরাধেও জড়িয়ে যাবেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, আমাদের কাছ থেকে (মিথ্যাচার করে) অন্যায় সিদ্ধান্ত আদায় করে নিলে মনে রাখবে, তোমরা আগুন দিয়ে উদর পূর্ণ করার ব্যবস্থা করছ। অতএব, তাকওয়া পরিত্যাগ করলে তোমরা নির্ঘাত শির্কের গহ্বরে মুখ থুবড়ে পড়বে। তাই ইস্তেগফার করতে করতে আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা কর এবং সর্বদা খোদাভীরুতা অবলম্বন কর।" *(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১ ডিসেম্বর ২০০৬)*

হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বলেন,

"আমি তো অনেক দোয়া করে থাকি, আমার জামা'তে যেন সেসব লোক অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং নামাযে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। রাতে উঠে সিজদায় মাটিতে পড়ে যায় এবং কান্নাকাটি করে এবং খোদার প্রতি অবশ্যকরণীয় বিষয়ে অবহেলা না করে। তারা যেন কৃপণ, অমনোযোগী ও মাটির কীট না হয়। আর আমি আশা রাখি, খোদা তা'লা সব দোয়া কবুল করবেন। আর আমাকে দেখাবেন, আমি আমার পরে এমন লোকদের ছেড়ে যাচ্ছি যারা চোখ দিয়ে ব্যভিচার করে না এবং যাদের মন পায়খানার ন্যায় খারাপ নয়। আর যারা মৃত্যুকে স্মরণ করে না। আমি ও আমার খোদা এমন লোকদের প্রতি বিরাগভাজন। আমি অনেক খুশি হবো, যদি এমন লোক (বয়আতের) চুক্তিকে প্রত্যাহার করে নেয়। কেননা, খোদা এ জাতিকে এমন একটি জাতিতে রূপান্তরিত করতে চান যাদের দৃষ্টান্ত দেখলে খোদাকে স্মরণ হয়, যারা খোদা-ভীরুতা ও পবিত্রতায় উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত। আর যারা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়। কিন্তু সেই দুষ্ট লোক যারা আমার হাতে হাত রাখে এবং বলে, 'আমরা ধর্মকে পার্থিব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছি' অপরদিকে তারা তাদের ঘরে ফিরে গিয়ে এমন দুষ্কর্মে লিপ্ত হয় যে, তাদের মনে শুধু পার্থিব জগৎ (ভোগ করার বাসনা) থাকে তাদের দৃষ্টিও পবিত্র নয়, তাদের অন্তরও পবিত্র নয়। তাদের হাত কোন পুণ্য কর্ম করে না এবং তাদের পা-ও কোন পুণ্য কর্মের দিকে এগোয় না। তারা সেই ইঁদুরের ন্যায় যারা অন্ধকারে প্রতিপালিত হয় এবং এতেই বসবাস করে আর সেখানেই মারা যায়। এদের (নাম) আকাশে আমার জামা'ত থেকে কেটে দেয়া হয়েছে। এরা অযথা বলে, আমরা এ জামা'তের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আকাশে এদের জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করা হয় না।"

(তবলীগে রেসালত, ১০ খণ্ড, পৃ: ৬১-৬২)

সংকলনে:
ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা

বিবাহ সংবাদ

–রিশতানাতা বিভাগ

- গত ২৬/০৮/২০১৯ ফারজানা আক্তার, পিতা: মোহাম্মদ ওহিদুল্লাহ গাজী, সাং: পার্শ্বেখালী, ডাকঘর: যতীন্দ্রনগর, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম, পিতা: মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান খান, গ্রাম: ঘড়িলাল, পো: চরামুখা, উপজেলা কয়রা, জেলা: খুলনা-এর বিবাহ ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪০।

- গত ১০/০১/২০২০ তানিয়া সুলতানা, পিতা: মোহাম্মদ হযরত আলী, সাং: পার্শ্বেখালী, ডাকঘর: যতীন্দ্রনগর, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ আবু হাসান, পিতা: মোহাম্মদ আইয়ুব আলী মোড়ল, সাং: মীরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর, থানা: শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪১।

- গত ২৭/১২/২০১৯ আশুরা আক্তার হেনা, পিতা: আব্দুল বারি মোড়ল, সাং পার্শ্বেখালী, ডাকঘর: যতীন্দ্রনগর, উপজেলা: শ্যামনগর, জেলা: সাতক্ষীরা-এর সাথে মোদাস্সের হোসাইন, পিতা: মোজাফ্ফর সানা, বতুল বাজার, কয়রা, খুলনা-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪২।

- গত ১৭/০১/২০২০ রিমা খাতুন, পিতা: আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, সাং: ভরতপুর, সাক্ষীকুল, বড়াইগ্রাম নাটোর-এর সাথে রাসেল আহমদ, পিতা: আব্দুস সাত্তার সাহেব, পাচপুরুলিয়া, পো: পুরুলিয়া, থানা: গুরুদাসপুর, নাটোর-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৩।

- গত ১২/১২/২০১৯ শাহানু, পিতা: মোহাম্মদ মেছান মিয়া, বেতাল, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে নাসিম আহমদ, পিতা: আঙ্গুর মিয়া, খাগাইর, কটিয়াদী, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ২,৫০,০০০/- (দুইলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৪।

- গত ২১/০২/২০২০ মোছা. ফরিদা আক্তার রিমি, পিতা: মরহুম মোহাম্মদ ফরিদ আহমদ, ওলি সোহেল রানা (বড় ভাই), আহমদনগর, ধাক্কামারা, পঞ্চগড়-এর সাথে মোহাম্মদ আজিজুল হক সবুজ, পিতা: সুরুজ মিয়া, ৩৭৫/৫ উত্তর পীরের বাগ, মিরপুর ১২১৬-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৫।

- গত ২৩/০২/২০২০ সোফিয়া খিলাত, পিতা: শহীদ জি, এম মহীবুল্লাহ্, ১৫/১ নিরালা আবাসিক এলাকা, খুলনা সদর, জেলা: খুলনা-এর সাথে মোহাম্মদ রিয়াজ আহমেদ, পিতা: মোহাম্মদ শরীফ আহমদ সরদার, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর বিবাহ ৫,০০,০০০/- (পাঁচলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৬।

- গত ১৭/০৫/২০২০ স্বপ্না পারভীন, পিতা: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, গ্রাম-মিরগাং, পো: যতীন্দ্রনগর-৯৪৫৫, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা-এর সাথে মোহাম্মদ কামরুজ্জামান কামাল পিতা: মরহুম হাফিজ উদ্দিন, গ্রাম: বালিয়ান, জাহাঙ্গীরপুর, নান্দাইল, ময়মনসিংহ-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৭।

- গত ২১/০২/২০২০ হাসনা রুহী বাধন, পিতা: মোহাম্মদ শাহজাহান বাবুল, উকিলপাড়া, সদর রোড, জেলা: বরিশাল-এর সাথে এবাদুর রহমান, পিতা: এহছানুর রহমান, ২৮৯, পূর্ব নাখালপাড়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৬৪৮।

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরণে অঙ্গীকার করবে, এখন হতে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে পবিত্র থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, যুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হতে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, তার শিকারে পরিণত হবে না।

৩

বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, সাধ্যানুযায়ী তাহাজ্জুদ নামায পড়বে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে, প্রত্যহ আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজের পাপসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার করায় মনোনিবেশ করবে। ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁর অপার অনুগ্রহ স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা ও বড়াই করবে।

৪

উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থায় তকদীরের বিধানের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। তাঁর পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ উপস্থিত হলে পশ্চাদপদ হবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হবে।

৬

সামাজিক কদাচার পরিহার করবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হবে না। কুরআনের অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে শিরোধার্য করবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলবে।

৭

অহংকার ও গর্ব সর্বতভাবে পরিহার করবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার, সহিষ্ণু ও দরবেশী জীবন যাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকবে এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

১০

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হলে, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশি গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে, জগতের কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মাঝে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

(মজমুআ ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৯-১৯০, ১২ জানুয়ারি ১৮৮৯)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার উদ্যোগে গত ২৭ মে ২০২০ তারিখ রোজ বুধবার ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে সাস্থ্যবিধি মেনে মহান খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এবং সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন থেকে তিলাওয়াত ও বঙ্গানুবাদ করেন মোহতরম বশীর উদ্দীন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা এবং দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন, নায়েব আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। এরপর উর্দূ নযম পরিবেশ করেন মোহতরম জি. এম. ইরফান রহমান।

অতঃপর খিলাফতের অফুরন্ত কল্যাণ এই বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মওলানা শাহ্ মুহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরুব্বি সিলসিলা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তারপর বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মোহতরম মওলানা মুহাম্মদ সোলাইমান সুমন, মুরুব্বি সিলসিলা, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

পরিশেষে প্রধান অতিথির ভাষণ ও সমাপণী দোয়া পরিচালনা করেন মোহতরম আলহাজ্ব মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

উল্লেখ্য, উক্ত অনুষ্ঠানটি এম.টি.এ বাংলাদেশ স্টুডিও-এর মাধ্যমে ইউটিইবে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

বশীর উদ্দীন আহমদ
জেনারেল সেক্রেটারী, ঢাকা

New Vol. No. 82 | 22nd & 23rd Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

15th June, 2020 ❑ Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

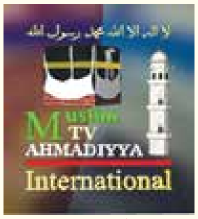

mta
INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন
অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন
০১৯১২-৭২৪৭৬৯

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং ভোর-রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Right Management
Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি
রেস্টুরেন্ট

ধানসিড়ি রেষ্টুরেন্ট
দোতলা
রোড নং-৪৫, প্লট-৩৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫
মোবাইল: ০১৭০০৮৩৩২৫২, ০১৯৩০২১৪২৮৪

Printed and Published by **Alhaj Mahbub Hossain M.A.** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)